# জাভা ও বলির নৃত্যগীত

শান্তিদেব ঘোষ






বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৯ পৌষ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস লিঃ। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা
৬.১

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে

জাভা এবং বলি দ্বীপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক বহুযুগের। সে আত্মীয়তার তথ্য আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই গুপ্ত ছিল, বাস্তব জীবনে তার স্বীকৃতি ছিল না। ১৯২৭ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ জাভা এবং বলি দ্বীপ ভ্রমণে যান ; তাঁরই দৌত্যে সেই বিস্মৃতপ্রায় যোগসূত্রটি আবার নতুন ক'রে আবিষ্কৃত হয়। তাঁর ভ্রমণের ফলে এই দুই দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিশেষ করে এদের নৃত্যগীত ও শিল্পকলা সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে। গুরুদেবের সেই ভ্রমণের পর সে-দেশবাসী একদল শিক্ষিতের মধ্যেও ভারতবর্ষের প্রতি আকর্ষণ দেখা গেল। সে-দেশের একজন শিক্ষাগুরু ও নেতা, নাম দেবান্তর, তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'তামানশিষ্য' নামে একটি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মাঝে মাঝে ছাত্র পাঠাতে লাগলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁদের কাছে সে দেশের নৃত্যগীতের নানা গল্প শুনতাম ও তা দেখবার জন্যে মনে খুবই আকাঙ্ক্ষা হত। তার কারণ গুরুদেবের আদেশে ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের অনুশীলনে যখন ১৯৩১ সাল থেকে কাজ শুরু করি, তখন থেকেই জাভা-বলির নৃত্যাভিনয়ের কথা বারে বারে মনে হত, ভাবতাম, আমাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগটা কোথায়, একবার নিজের চোখে দেখা দরকার।

এই অবস্থায় ১৯৩৯ সালে সেখানে যাবার ব্যবস্থা করা গেল। আমার একান্ত আগ্রহ দেখে গুরুদেব সে-দেশে যেতে অনুমতি দিলেন ও সেখানকার এক সুলতানকে চিঠি লিখলেন। তাঁর চিঠিতে সুলতান সেখানে আমার থাকা খাওয়া ও শেখার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ঐ বৎসরের মে মাসে আমি জাভার উদ্দেশে কলকাতা থেকে জাহাজে চড়লাম। জাভার পথে রেঙ্গুনে ছিলাম এক মাস, সেখানকার নৃত্যনাট্য দেখবার জন্যে। তার পরে সোজা জাভায় পৌঁছে আমার গন্তব্য স্থান যোগজায় উপস্থিত হলাম। একই সময়ে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ও বর্তমানে খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মৃণালিনী, তাঁর মা শ্রীযুক্তা

অমুস্বামীনাথনকে সঙ্গে নিয়ে সিংহলের পথে যোগজায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীমতী মৃণালিনীর জন্যেও গুরুদেব স্থলতানকে চিঠি দিয়েছিলেন।

সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের যাবতীয় ব্যবস্থার দায়িত্বভার স্থলতান দিয়েছেন 'তামানশিষ্য' বিদ্যায়তনের উপর। এখানে আমরা আমাদের শান্তিনিকেতনের পুরাতন ছাত্রদেরও পেলাম। এই শিক্ষায়তনের আতিথ্যে ও যত্নে আমরা জাভায় ছিলাম দুই মাস, আর এক মাস আমি কাটিয়েছিলাম বলিদ্বীপের 'দেনপাশার' শহরে। দুই দেশের নৃত্যগীত ও অভিনয় দেখেছি ও শুনেছি রাতের পর রাত। 'তামানশিষ্য' বিদ্যায়তনে সে-দেশের প্রাচীন নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষার খুবই সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। অভিজ্ঞ নৃত্যকলাবিশারদ বয়স্ক রাজকুমারদের তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যায়তনে ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই নাচ শিখত। এখানকার ছাত্রীরা নাচে এতদূর দক্ষ ছিল যে রাজপ্রাসাদেও তাদের ডাক পড়ত রাজকুমারীদের সঙ্গে নাচতে। এখানে প্রতিদিনই অনেক রাত পর্যন্ত নৃত্যগীতের চর্চা হত। তাই দেখতাম। স্থলতানের অনুমতি ছিল প্রাসাদের যাবতীয় নৃত্যগীত অভিনয় ও তার মহড়ায় আমাদের অবাধ প্রবেশের। পাশাপাশি দুই রাজ্যের দুই স্থলতানের প্রাসাদে দুটি বিখ্যাত নৃত্যনাট্য এই সময় আমরা দেখলাম। আর বলি-দ্বীপে প্রতিরাত্রেই কোনো-না-কোনো উপলক্ষ্যে নাচ-গান-বাজনা আছেই। একটু বড় রকমের কোনো উৎসব এলেই সেখানে গ্রামে গ্রামে নাচ-গান-বাজনার ধুম পড়ে যায়। তাই সেখানেও খুব একটা স্বাভাবিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সেইসব নাচগান দেখেছি। দেখে মুগ্ধও হয়েছিলাম।

সব দেখে শুনে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝেছিলাম যে, জাভা ও বলিতে এখনো যেভাবে নৃত্যনাট্য অভিনীত হয় তার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত ভারতের প্রাচীন কোনো নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতির মিল নেই। সে-ধারায় বর্তমানে চীনদেশের প্রাধান্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। ঐতিহাসিকরা

বলেন, এক যুগে ভারতীয় নৃত্য-গীত-বাদ্য চীনদেশের নৃত্যাভিনয়ের উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেই প্রাচীন পদ্ধতির নমুনা ভারতে আজ কোথাও মিলবে না। ভারতে তা লুপ্ত হলেও চীন ও যবদ্বীপের এইসব প্রাচীন নৃত্যনাট্যধারায় তার বহুরকম নমুনা মিলতে পারে বলে মনে হয়।

অল্পসময়ের মধ্যে সে দেশের কলাবিদ্যাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারি নি; তা সম্ভবও নয়; কিন্তু তাকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম বিশেষভাবে।

## জাভা ও বলির নৃত্যনাট্য

যে রাত্রে জাভার যোগজা শহরে এসে পৌঁছলাম, সেই রাত্রিতেই সেখানকার সুলতানের প্রাসাদে এক রাজকীয় ভোজের আয়োজন ছিল। উপলক্ষ্য হল সে দেশের কোনো উচ্চপদস্থ ডাচ রাজকর্মচারীর বিদায়-ভোজ। স্বয়ং প্রাদেশিক শাসনকর্তা থেকে শুরু করে বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এ দেশের প্রথানুযায়ী ভোজের সঙ্গে ওয়াংঅং নৃত্যনাট্যের আয়োজন করা হয়েছিল চিত্ত-বিনোদনের জন্যে। সুলতান আমাদেরও নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল আমরাও এই উপলক্ষ্যে নৃত্যনাট্য দেখি। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল প্রাসাদে। প্রাসাদের দরজায় প্রবেশপথেই রাজপরিবারের দুই জন যুবক নিজেদের পরিচয় দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। দু জনেই ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারেন। এঁরা আমাদের নিয়ে চললেন প্রাসাদের 'পণ্ডপ' নামে বাংলাদেশের আটচালা মণ্ডপের মত প্রকাণ্ড একটি স্থানে। সেই বিরাট পণ্ডপ দাঁড়িয়ে আছে কতগুলি বিশাল কাঠের থাম ও কাঠেরই নানা রকম কড়ি-বরগার উপরে। উপরে টালির আচ্ছাদন। নানা রঙে রঙিন বস্ত্রে ও নকশায় এই থাম ও কড়ি-বরগা সুসজ্জিত। সমস্ত মেঝেটি সুন্দর শ্বেতপাথরে বাঁধানো।

পণ্ডপের চারদিকে কোনো দেয়াল নেই। অন্দরমহল ও অন্যান্য মহল থেকে আসবার ও যাবার সুসজ্জিত শান-বাঁধানো পথ রয়েছে। শুনলাম, এখানেই সুলতানের যাবতীয় দরবার, উৎসব, অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান, অভ্যর্থনা, ভোজ ও নৃত্যগীত সম্পন্ন হয়। পণ্ডপের একদিকে সুলতানের সিংহাসনটি মোটা কাপড়ের আচ্ছাদনে আবৃত। সিংহাসনটি সুলতান ব্যবহার করেন বৎসরে কয়েকবার বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে। পণ্ডপটির খানিক তফাতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের নির্দিষ্ট স্থানে রাজপুরীর কর্মচারী দাসদাসী ও তাদের সন্তানসন্ততিরা ভিড় করে বসে আছে। খাওয়া-দাওয়ার ও নাচ-গানের ব্যবস্থার জন্যে একদল সুসজ্জিত ভৃত্য খুব ব্যস্ত, কিন্তু কোনো হৈচৈ বা গোলমাল নেই। সেই পণ্ডপে ও পণ্ডপ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে এত লোকজন থাকা সত্ত্বেও সতর্ক স্তব্ধতা সর্বত্র বিদ্যমান।

আমাদের জন্য নির্দিষ্ট চৌকিতে আমরা বসলাম। অদূরে পণ্ডপের এক ধারে গামেলানের সংগীত বাজছিল। কিছুক্ষণ বাদে বয়সে প্রৌঢ় এক সুপুরুষ ব্যক্তি দেশি ও বিদেশি মিশ্রিত সাজে সুসজ্জিত কয়েকজন মহিলার সঙ্গে অন্দরের পথে প্রবেশ করলেন। শুনলাম তিনিই সুলতান, সঙ্গে তাঁর পাটরানী ও কয়েকজন সহচরী। গামেলান-সংগীত বেজে উঠল সজোরে। একই প্রাঙ্গণের আর-এক প্রান্ত থেকে শোনা গেল বিলিতি ব্যাণ্ডের বাজনা। চারদিকে চলাফেরা ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হল। যাঁরা চেয়ারে বসে ছিলেন আমাদের মত তাঁরা সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। সুলতান অভ্যর্থনা-স্থানের উপরে কার কোথায় বসার ব্যবস্থা হয়েছে একবার দেখে নিলেন, এবং প্রধানা পত্নীর সঙ্গে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। তখন গামেলানে বাজছে সুলতানের বন্দনগীত। এক-দল গাইয়েও সেই সঙ্গে গান ধরল।

প্রাসাদে ঢোকার পর থেকেই সেখানকার লোকজনদের চলাফেরা ওঠাবসা সাজ-পোশাকের একটা বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ল, যা প্রাসাদের বাইরে দেখি নি। দেখলাম সেদেশি কোনো ব্যক্তির পায়ে জুতো নেই। মহিলাদের গায়ে সেদেশি জামা নেই। স্বতন্ত্র বস্ত্রে

বুক-পিঠ ঢাকা, কিন্তু কাঁধ খোলা। খাড়া দাঁড়িয়ে, কেউ হাঁটছে না। জানা গেল, প্রাসাদের অভ্যন্তরে কতগুলি নিয়ম বহু যুগ ধরে চলে আসছে। এদেশি কোনো সাধারণ ব্যক্তি প্রাসাদের অভ্যন্তরে বসবার আলাদা কোনো চৌকি পায় না। মাটিতে বা মেঝেতে তাকে বসতে হয়। স্থলতানের সামনে এদেশবাসী কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আলাপ বা নমস্কার করে না। সবই করতে হয় মাটিতে বসা অবস্থায়। স্বাভাবিক রীতিতে হাঁটবার হুকুম নেই, হাঁটুর উপর ভর করে চলতে হয়। এই ভাবে চলাটা দেখতে আমাদের কাছে কষ্টকর হলেও ওরা দেখলুম এতে বেশ অভ্যস্থ। স্থলতানের সঙ্গে বাক্যালাপের সময় প্রতি কথায় দুই হাত জোড় করে বুড়ো আঙুল নাকে ঠেকিয়ে নমস্কার জানাতে হবে। স্থলতান সামনে উপস্থিত না থাকলেও প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরে যাবার সময় স্থলতানের বাসগৃহের দিকে মুখ করে নমস্কার জানাতে হয়।

আর একবার সজোরে বিলিতি বাজনা বেজে উঠতেই চেয়ে দেখি কালো রঙের রাত্রিভোজের সাজে সজ্জিত বিদেশি রাজপুরুষেরা প্রবেশ করছেন, তাঁদের সামনে চলেছে মোমবাতি হাতে প্রাসাদের দু জন কর্মচারী। স্থলতান ও নিমন্ত্রিত অতিথিরা সকলে আবার উঠে দাঁড়ালেন। রাজপুরুষদের সঙ্গে করমর্দন করে স্থলতান তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে বসালেন। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল।

ভোজের আয়োজন বিলিতি মতে কিন্তু পরিবেশনের কায়দাকানুনটা মনে হল তাদের দেশি। যারা খাদ্য-বিতরণের জন্যে নিযুক্ত তাদের পরনে বাতিকের লুঙ্গি, মাথায় বাতিকের সাধারণ পাগড়ি, পিঠে গোঁজা এদেশি ছোরা। গায়ের জামাটা বিদেশি ও প্রত্যেকের হাতে বিদেশি সাদা দস্তানা আঁটা। খাদ্য-বিতরণের কায়দাও অভিনব। একজন পরিবেশকের পিছনে খাদ্যদ্রব্য হাতে নিয়ে একদল বাহক বুক টান করে চলেছে। প্রাসাদের নিয়ম অনুসারে হাঁটু গেড়ে চলা ও নমস্কারের দায় কেবল পরিবেশকের, বাহকেরা তা থেকে পায় মুক্তি।

খানা আরম্ভ হতেই প্রকাণ্ড দুটি প্রাচীন পুঁথি বা বই—কাপড়ে

মোড়া ছোট দুটি জলচৌকির উপরে সাজিয়ে দুটি লোক বয়ে আনল, সঙ্গেসঙ্গে মোমবাতি হাতে আর-একজন। সুলতান ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে এসে প্রচলিত নিয়মে নমস্কার ইত্যাদি ক'রে নিজ নিজ স্থানে গিয়ে বসল। এর পরেই এল সংখ্যায় প্রায় তিরিশ জনের মত গান-বাজনার একটি দল। শুরু হল গান-বাজনায় প্রস্তাবনার পালা প্রথমে, তার পরে নাচ।

সেই রাত্রে তিনটি নাচ দেখানো হল। প্রথমটি নাচল একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে, মেয়ে সেজে। সাজপোশাক এমন নিখুঁত ছিল যে না বলে দিলে তাকে পুরুষ বলে চিনতেই পারতাম না। এ দেশে এ নাচটিকে বলে গোলক। নাচের ভিতর দিয়ে সে দেহসজ্জার অভিনয়ই করে গেল একঘণ্টা ধরে। এত ধীর স্থির ধরনের নাচ কখনো দেখি নি। অন্তত ঢিমালয়ের নাচ দেখে যে আনন্দ পাওয়া যায় এইখানেই প্রথম তা অনুভব করলাম।

সমস্তক্ষণ আধখানি হাঁটু মুড়ে, মাথা হাত ও শরীরকে নানা ছন্দে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে ধীর লয়ে পা ফেলে চলার যে নাচ তাতে রীতিমতো প্রয়োজন হয় মনের ধৈর্য ও দেহের শক্তি। এরা একই ভঙ্গিকে অনেকবার করে দেখায়, এবং নিজে এ নাচ না শিখলে বাইরে থেকে এর গতির নিয়মটি ধরা বড় মুশকিল।

পরে দেখলাম, ভীষ্মের সঙ্গে কোনো-এক পাণ্ডবের যুদ্ধ। দুই নর্তক অভিনয়-ভূমির দুইধারে বসে আছেন। বাজনার সঙ্গেসঙ্গে উভয়ে নমস্কার করে উঠে পড়ল। নৃত্যভঙ্গিতে একজন আর-একজনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

এইখানে বলে রাখা আবশ্যক, প্রবেশ ও প্রস্থানের নৃত্যভঙ্গিতে নাটকের চরিত্র-বিশেষে তারতম্য ধরা পড়ে। গল্পের প্রধান নায়কের চলায় যে শান্ত পৌরুষের ভাব প্রকাশ পায়, রাবণ রাক্ষস দানব ইত্যাদির চলার ভঙ্গিতে তা হয়ে ওঠে বেশ উগ্ররকমের। মহাভারত ও রামায়ণের বিখ্যাত রাজা ও দেবতাদের চাল-চলনে যে মাধুর্য প্রকাশ পাবে, ভীম

ঘটোৎকচ রাবণ ইত্যাদি বীরদের বেলায় তা থাকে না। তাদের অমানুষিক দৈহিক বলের সঙ্গে মিল রাখতে গিয়ে নাচের ভঙ্গিকে আরো একটু কড়া করে দেখাতে হয়। অর্জুন বিখ্যাত বীর হলেও নাচের বীর্যে ভীমের নীচে তার স্থান। অন্যান্য রাজারা মাটি থেকে যতটা উপরে পা তুলবে ভীম-ঘটোৎকচের পা তার চেয়ে আরো উপরে ওঠা চাই। তাতে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, নাচে ও নর্তকদের সেই পরিমাণে শক্তি থাকা চাই। রাজার চলনে আর ভৃত্যের চলনে প্রভেদ আছে। তেমনি বিশেষ পার্থক্য দেখি নারী ও পুরুষের চলন-ভঙ্গিতে। এই ভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা কতগুলি নিয়ম করে গিয়েছিলেন। যেমন মেয়েদের চলা হবে অতি ধীর, মন্থর। পুরুষদের গতি তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত, বড় বড় বীরদের গতি আরো দ্রুত, সকলের চেয়ে দ্রুত অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের চলন। সবচেয়ে বেপরোয়া ও বেহিসেবি দ্রুত ভঙ্গির চলন হল ভাঁড় বা বিদূষকের। ঠিক এ রকমের কোনো নিয়ম আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন কোনো নৃত্যনাট্যে এখন আর দেখতে পাই নে। চীন-দেশের প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের এই রকমের একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম আছে বলে শুনেছি। ভারতের নাট্যশাস্ত্রের তেরো অধ্যায়ে অভিনয়ের পাত্রপাত্রীদের চলনভঙ্গির রীতিনীতি বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, ভারতে প্রাচীন কালে অভিনয়ে চলা বিষয়ে নানা প্রকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। সে প্রথা ভারতে আজকাল আর কোথাও দেখা না গেলেও, চীন জাভা দেশের প্রাচীন অভিনয়ে তা আজও বেঁচে আছে। এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

ভীষ্ম মহাভারতের একটি সম্মানিত ব্যক্তি, তাই তাঁর নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে অপরের নৃত্যভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা গেল। চলার ভঙ্গি উভয়েরই এক, কিন্তু ধরনে একজন নরম, অপরজন শান্ত। আর-একটি নিয়মের কথাও জানা গেল। প্রাচীন কাহিনী মাত্রেই দুটি সুস্পষ্ট পক্ষ থাকে—একটি ন্যায়ের পক্ষ অপরটি অন্যায়ের—যেমন রাম রাবণ, পাণ্ডব

কৌরব। রঙ্গভূমিতে গায়কদল যে দিকে মুখ করে বসবে অভিনয়ে যারা ন্যায়ের পক্ষকে নৃত্যরূপ দান করবে তারা সব সময়ে ডান দিক থেকে প্রবেশ ও প্রস্থান করবে। যারা দুষ্টপক্ষ তারা করবে বাঁ দিক থেকে।

সব নৃত্যনাট্যেই গায়ক ও বাদকের দল ছাড়া একজন কথক বা নেতা থাকে, তাকে বলে দালাং। এর আসল কাজ প্রাচীন নাটকের সূত্রধারের মত। প্রাচীন জাভার 'কবি' ভাষায় সে নৃত্যাভিনয়ের ঘটনাগুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। আরম্ভে যে বইগুলি বয়ে আনা হয়েছিল সেগুলিই হল এই নৃত্যাভিনয়ের বই। বই থেকে কথকের পাঠ শুনে মনে হবে যেন আমাদের দেশের পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ। আমরা যে যুদ্ধাভিনয় দেখেছিলাম, বইটি থেকে তারই বর্ণনা পাঠ করলেন পাঠক। কিন্তু আমরা দেখলাম যুদ্ধের নাচটা। কল্পনায় দুটিকে মিলিয়ে নিতে হল।

পরে দেখানো হল সুবালি ও রাবণের যুদ্ধ। সুবালি হল আমাদের রামায়ণের বালি। রামের বন্ধু বলেই বোধ হয় সু কথাটি সামনে বসানো হয়েছে, কারণ প্রাচীন জাভার ভাষায়ও সু শব্দের অর্থ হল ভালো।

এখানে রাবণের নাচের ভঙ্গিতে যে শক্তির প্রকাশ দেখা গেল তা আর-সকলকে হার মানায়। দেখলাম, সেই শক্তিকে প্রকাশ করতে গিয়ে রাবণ তার চলার ভঙ্গিতে পা যতখানি সম্ভব সোজা করে উপরে তুলে পরে মাটিতে নামাচ্ছে, আর দুই হাত যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দিচ্ছে। এদিকে বানর-রাজার বানরোচিত চঞ্চলতা বেশি। রাবণের চলায় ছিল বেশ একটা রাজোচিত ধীর গম্ভীর ভাব। এই দুই যুদ্ধের অভিনয় শেষ করতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল। দৌড়ে রঙ্গভূমিতে ঢুকে আমাদের দেশের যাত্রার মত তলোয়ার বা গদা ঘুরিয়ে শত্রু নিপাত করলে চলবে না; এরা করবে আরম্ভে যুদ্ধের পাঁয়তাড়া, অর্থাৎ দুই যোদ্ধা রঙ্গভূমির দুইধার থেকে যথা-নিয়মে পা ফেলে আসবে; তার পরে নৃত্যভঙ্গিতে নমস্কার, পরস্পরকে

নিরীক্ষণ, যেন দূর থেকে একজন আর-একজনকে দেখছে; পরস্পরের প্রতি এগিয়ে যাওয়া পেছিয়ে আসা; একবার বাঁ দিকে একবার ডান দিকে যাওয়া। এইসব হল যুদ্ধের ভূমিকা। এর পর কিছুক্ষণের মত গামেলানের বাজনা বন্ধ হল, নর্তকরাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন বিশ্রাম নিচ্ছে। যেই আবার গামেলান-সংগীত বাজতে শুরু করে নর্তকরা তখন প্রকৃত যুদ্ধের নৃত্য শুরু করে দেয়। পালাক্রমে একজন আর-একজনকে তাড়া করে যাচ্ছে, অস্ত্র বা হাতের দ্বারা আঘাত করছে, কিন্তু সে আঘাত অঙ্গ বা অস্ত্রকে স্পর্শ করে না, আঘাতের ইঙ্গিত মাত্র। প্রত্যেকেই একবার করে অপরকে মারের ভঙ্গিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এই যুদ্ধনৃত্যে দুই পক্ষই সমানভাবে বীরত্ব দেখাবার অবসর পায়। উভয়েই উভয়কে একবার হার মানাবে। হেরে গিয়ে একজন বসে পড়লে অপরজন তাকে আর তাড়না না করে নিজের শক্তির বড়াই করে বিজিতকে টিটকারী দেবে। অভিনয়ের শেষে উভয়ে একই সঙ্গে যখন প্রস্থান করল তখন বাঁ দিকে যে চলে গেল সেই যে হারল সেটা সঙ্গেসঙ্গে মনে করে নিতে হবে। গল্পে মৃত্যুর কথা থাকলেও মৃত্যুর কোনো অভিনয় দেখানো হয় না। পরাজিত ও জয়ী পক্ষ একই সঙ্গে দু দিকে বেরিয়ে যায়।

জাভার যুদ্ধনৃত্যের কথা আর-একটি কারণে আলোচনার যোগ্য। নৃত্যাভিনয়ে যুদ্ধের দৃশ্যটাকে সত্যসত্যই ওরা নাচের জিনিস করে তোলে। অর্থাৎ নৃত্যের সময় নর্তকরা যেসব অঙ্গভঙ্গি করে তা সাধারণ দেহভঙ্গির নানাপ্রকার ইঙ্গিত মাত্র, তা সাধারণ দেহভঙ্গির হুবহু অনুকরণ নয়। অভিনয়ে যুদ্ধকে তারা নাচের ছন্দে প্রকাশ করে। আমাদের দেশের প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ে যুদ্ধের নাচ আছে, নানা অস্ত্রে বা পরস্পরকে দুই হাতে আকর্ষণ ক'রে। যদিও তা সত্যিকার যুদ্ধ নয়, তবুও তার ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গির প্রকাশটাই বেশ বড় হয়ে দেখা দেয়। কথা-কলিতে ভীমের হাতে থাকে ছোট একটি নকল গদা, তেমনি থাকে অন্য

যোদ্ধাদের হাতে ছোট ছোট ঢাল ও তলোয়ার। সেই যুদ্ধের ভঙ্গিতে থাকে সাধারণ যুদ্ধের অনেকখানি অনুকরণ। আহত হয়ে আসরে পতন ও মৃত্যুও বাদ যায় না। জাভাতে এ দৃশ্য অচল, তা সে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধই হোক আর তীর-ধনুকের যুদ্ধই হোক। সবই যুদ্ধের নামে যেন খেলা। তলোয়ারের বদলে দেখি ছোট ছোট নকশা-কাটা ছোরা ও ঢাল, আর তীর-ধনুক খুব বেশি হলে একহাত লম্বা। একে অন্যকে অক্রমণ করবে ; কিন্তু আক্রমণের নৃত্যগতি হল সেখানে দেখবার বিষয়—সে ভঙ্গিতে স্বাভাবিকতার একটুও চিহ্ন নেই। একজন আর-একজনকে যখন আঘাত করে তখন তাদের দেহে তার ইঙ্গিত মাত্র ফোটে, পরিষ্কার করে বোঝাবার কোনো চেষ্টা নাচিয়েরা করে না।

এদের নৃত্যাভিনয়ের সাধারণ নৃত্যগতি খুব ধীর এবং সেই ধীরতা যুদ্ধনৃত্যেও প্রবল। দ্রুতগতি নেই, কোনোপ্রকার ক্রোধের অভিনয় নেই, শব্দ নেই, চিৎকার নেই। সেই যুদ্ধনৃত্যে কোনো প্রকার দৈহিক বা মানসিক চঞ্চলতার প্রকাশ নেই। নিয়মে বাঁধা এইসব যুদ্ধনৃত্যকে ওরা ইচ্ছামত বদল করে না। প্রাচীনেরা সব নৃত্যকে যে নিয়মে বেঁধে দিয়ে গেছেন তাকে অবিকৃত রাখাই এরা কর্তব্য মনে করে।

নাচে স্বাধীনতা নেই ব'লে একথা ঠিক নয় যে, প্রকৃত শিল্পীকে ওরা নৃত্যরচনায় স্বাধীনতা দেয় নি। ওরা বলবে, 'তুমি যদি নাচের সত্য মর্ম বুঝে থাক প্রকৃত সাধক-শিল্পীর মন দিয়ে, তবে রচনা করো নতুন নাচ, আর তা যদি না পার তো বড় বড় শিল্পীরা যে আদর্শ রেখে গেছেন তাকে বাঁচিয়ে রাখাই তোমার একমাত্র কর্তব্য। সাধারণ শিল্পীর এ ছাড়া আর কিছু করবার নেই। নতুন সৃষ্টির প্রেরণা থাকা উচিত, কিন্তু না বুঝে বড় শিল্পীকে ভাঙতে যাওয়া দোষণীয়।'

ওদের ঐ যুদ্ধনৃত্য দেখে আমার ঐ কথাই মনে হত যে, যখন স্বাভাবিক দেহভঙ্গিকে নাচের জন্য যথাসম্ভব বিকৃত ক'রে, সেই বিকৃত ছন্দরূপকেই আমরা নাচের পক্ষে স্বাভাবিক মনে করি তখন যুদ্ধনৃত্যেও সেই পথের ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। নাচ দেখতে গিয়ে আমরা

সত্যকার রক্তারক্তি খুনোখুনি তো দেখতে ইচ্ছা করি নে ; সেখানে যুদ্ধকে নাচের আদর্শে দেখতে ইচ্ছা করি। সেই নাচের আদর্শে চালিত যুদ্ধ-নৃত্যের একটি বিশেষ রূপ জাভা-বলির নৃত্যাভিনয়ে আমার কাছে প্রথম ধরা পড়ল। এ বিষয়ে ভারতীয় নৃত্যশিল্পীদের নতুন ক'রে ভাবা উচিত ; কারণ সমস্ত পূর্বদেশের প্রাচীন যুদ্ধনৃত্যের এই হল আদর্শ, ভারতই তাকে পথ দেখিয়েছিল, কিন্তু আজ সে যে অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

রাবণ ও সুবালির যুদ্ধনৃত্যে সুবালির বানরোচিত চঞ্চলতা ও ভাব-ভঙ্গি বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। এ-ক'টি নৃত্যই এদেশের ভিন্ন ভিন্ন নৃত্য-নাট্যের অংশবিশেষ।

যোগজার প্রাসাদে আরো কয়েকবার নৃত্যনাট্য দেখেছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই লক্ষ্য করেছি যে, এই নৃত্যাভিনয়ে মেয়েদের ভূমিকা গ্রহণ করে পুরুষেরা। অথচ এখানে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা আমাদের দেশের মুসলমান সমাজের মত বাধাগ্রস্ত নয়। স্কুলে শহরে গ্রামে ছেলেমেয়েরা সর্বদাই একসঙ্গে চলছে পড়ছে গাইছে অভিনয় করছে। প্রাচীন নাচের বেলায় কেবল এই পার্থক্য। তেমনি পার্থক্য দেখেছি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সুলতানের প্রাসাদের নৃত্যনাট্যে। সেখানে নৃত্যনাট্যের অভিনয় করে কেবল মেয়েরা। মেয়েরাই পুরুষের অংশ গ্রহণ করে। অথচ সেখানে সামাজিকভাবে মেয়েদের স্বাধীনতা পুরুষদের সমান। সবই একসঙ্গে হচ্ছে। শহরের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নারীপুরুষ যে একত্রে অভিনয় করে, তাও দেখেছি।

এখানে রাজপুরুষেরা নাচকে কতখানি যে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে। সুলতানের দ্বিতীয় ভ্রাতা সে দেশের একজন নামকরা নর্তক, বয়সে প্রৌঢ়, তাঁর বাড়ির পণ্ডপে তিনি নৃত্য-শিক্ষার একটি বিদ্যালয় খুলেছিলেন, নিজেই ছেলেমেয়েদের নাচ শেখাতেন, কিন্তু নাচের সময় কখনো কোনো ছাত্রীর দেহ স্পর্শ করতেন না। একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, মুসলমানধর্মে এ ধরনের

নাচগান তো নিষিদ্ধ, আপনারা তা মানেন না কেন? তার উত্তরে রাজকুমার বলেছিলেন যে, যদি এইসব নাচ-গান-বাজনা না থাকত তবে নির্মল আনন্দে জীবন কাটানো অসম্ভব হত। পূর্বপুরুষেরা মনে যদি কিছু শান্তি বা আনন্দ পেয়ে গিয়ে থাকেন তো এই নৃত্যগীতের মারফতেই। তাই ধর্মে নিষেধ থাকলেও একে ত্যাগ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এখানকার নৃত্যগীতের আবহাওয়ায় গভীর শান্তির অনুভূতি জাগে, এটা আমিও অনুভব করেছি। মনে হয় যেন নৃত্যগীতে আরাধনা চলেছে।

এখানে দুই সুলতানের প্রাসাদের নৃত্যনাট্য-অভিনয়ের সময় কোনোরকম পরদা ব্যবহার করতে দেখি নি। আমাদের দেশে কথাকলি নর্তকরা যেভাবে পরদা ব্যবহার করে, সেভাবেও নয়। রঙ্গভূমিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় যাত্রার মত শেষপর্যন্ত তাদের দেখা যায়। রঙ্গভূমিতে কোনো প্রকার দৃশ্যসজ্জার রীতি নাকি পূর্বে ছিল না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রভাবে কোনো কোনো নৃত্যনাট্যে স্বাভাবিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। বাংলাদেশের যাত্রার বা দক্ষিণদেশের কথাকলি-অভিনয়ের মত রঙ্গমঞ্চ নেই বলে সবদিকে দর্শকের বসবার স্থান হয়। কেউ দেখে সামনে থেকে, কেউ পাশ থেকে, যারা আগে এসে জায়গা পায় না তারা দেখে পিছন থেকে। যাত্রার মতনই দূর থেকে রঙ্গস্থলে আসতে হয়। তফাত কেবল এই যে, যাত্রার অভিনেতারা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রবেশ ও প্রস্থান করে, এখানে ওরা করে নাচের ভঙ্গিতে।

হিন্দুযুগে পাওয়া রামায়ণ-মহাভারতের গল্পের প্রভাব তাদের মধ্যে পরবর্তী যুগে কিভাবে কাজ করেছে তারই নমুনাস্বরূপ সেখানকার একটি বিখ্যাত নৃত্যনাট্যের গল্প সংক্ষেপে বলছি।—

ঋষি প্রকোলমূর্তি বৃদ্ধবয়সে দেবী শিতিসুন্দরীর প্রেমে পড়লেন। শিতিসুন্দরী হলেন কৃষ্ণের কন্যা। ঋষি, পুতুংগুরিত্র নামে তাঁর এক শিষ্যকে দ্বারাবতীতে পাঠালেন বিবাহের প্রস্তাব বহন করে। সেই সময় রাজা সুযোধন ছিলেন সস্তিনার রাজা, তিনি ও তাঁর পুত্র লক্ষ্মণের জন্যে শিতিসুন্দরীকে প্রার্থনা করে লোক পাঠালেন। দ্বারাবতীর রাজা

কৃষ্ণ পড়লেন উভয়সংকটে। কা'কে ছেড়ে কা'কে রাখবেন এই হল তাঁর দুর্ভাবনা। বুদ্ধি করে প্রস্তাব পাঠালেন যে, যিনি জন্তুসেনা সংগ্রহ করতে পারবেন, অর্থাৎ কেবল জন্তুর দ্বারা যিনি একটি সৈন্যবাহিনী রচনা করতে পারবেন এবং যাঁর সেনাপতি হবে একটি বানর, তাঁকেই তিনি তাঁর কন্যা দান করবেন। রাজা সুযোধন পাণ্ডবদের কাছে জন্তু-সেনা সংগ্রহের আবেদন জানালেন। পাণ্ডবরা অঙ্কবিজয়কে পাঠালেন কণ্ডালিসাদায় ময়ঙ্কর নামে এক ঋষির কাছে, তিনি জাতিতে বানর। প্রকোলমূর্তি সাহায্য চেয়ে পাঠালেন দেবতার কাছে। দেবতারা তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন এবং কপিবরের সেনাপতিত্বে পৃথিবীতে একদল জন্তুসেনা পাঠালেন। এর মধ্যে জটাসুর নামে এক অসুররাজও শিতি-সুন্দরীকে বিবাহের ইচ্ছায় দ্বারাবতীতে উপস্থিত। সকলে মিলে দ্বারা-বতীতে একটা তুমুল যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে পাঠালেন দ্বারাবতী রক্ষা করতে। যাই হোক, বহু হাঙ্গামা যুদ্ধ ইত্যাদির পর শেষ পর্যন্ত অঙ্কবিজয় সকলকে একে একে পরাজিত করে শিতিসুন্দরীকে গ্রহণ করলেন। দ্বারাবতীতে শান্তি এল।

জাভার নৃত্যনাট্যের গল্পে যুদ্ধের কথাই বেশি। তাই নাচের সময় কিছুক্ষণ বাদেই যুদ্ধের অভিনয় চলতে থাকে।

জাভার সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন নৃত্যনাট্য যেমন সমা-রোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, বলির অবস্থা তা নয়। এখানে সাধারণ গৃহস্থ গ্রামবাসীরাই এর চর্চা করে। তাই এখানকার নৃত্যনাট্যের আয়োজনে সাজে-পোশাকে জাভার মত জাঁকজমক নেই। মাস নামে বলির একটি গ্রামে মন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রামায়নের ঘটনা নিয়ে একটি নৃত্যনাট্য দেখেছিলাম। এর অভিনেতারা সকলেই সেই গ্রামের অধিবাসী, চাষ-বাসই এদের একমাত্র উপজীবিকা। গ্রামের মন্দিরই এদের ক্লাবঘর। সেখানেই রামায়ণের সাজ-পোশাক থাকে। বিকেলের দিকে যে যার মত এসে সাজ-পোশাক শেষ ক'রে গামেলানের বাজনায়, গানে, কথায় মিলিয়ে অভিনয় শুরু করল।

এই নৃত্যনাট্যেই প্রথম পরদার ব্যবহার চোখে পড়ল। তিন-চার গজ তফাতে তুটি বাঁশের খুঁটি পোঁতা। মাথার হাতখানেক উপর দিয়ে নেওয়া একটি তার ঐ তুটি খুঁটিতে বাঁধা হয়েছে। সেই তারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তুটি কাপড়ের রঙিন পরদা, সেটি ঠেলে সেখান থেকে সব অভি-নেতারা নিজেদের সময়মত প্রবেশের অভিনয় করল। অভিনয় বলছি এইজন্য যে, পরদার অপর দিকে যখন তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তখনো তাদের দেখা যায়। তাই এইরূপ পরদা ব্যবহারের কোনো তাৎপর্য খুঁজে পেলাম না।

গল্প আরম্ভ হল রামায়ণের পঞ্চবটী থেকে। প্রথমে সীতা ও সহচরীদের প্রবেশের পরে এল রাম লক্ষ্মণ ও তাদের তুই ভৃত্য বা সঙ্গী। সকলেই উঠোনের একদিকে গিয়ে বসল। তার পরে দেখলাম মারীচ ও রাবণকে। মায়ামৃগ হয়ে সীতার কাছে যেতে মারীচকে আদেশ করল রাবণ। সীতার সামনে মায়ামৃগের প্রবেশ। সীতা ও সহচরীদের মায়ামৃগ ধরবার বিফল চেষ্টা। রামকে ধরে দেবার জন্যে অনুরোধ। রাম ধরতে না পেরে তীর-ধনুক নিয়ে হরিণের পিছনে পিছনে ছুটল। সীতা লক্ষ্মণকে প্রায় জোড়হাত করেই রামের সন্ধানে পাঠাল। কিন্তু লক্ষ্মণ যাবার আগে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সীতাকে থাকবার জন্যে কোনো নির্দেশ দিল না। সন্ন্যাসীবেশে রাবণের প্রবেশ এবং সীতাকে নিয়ে পলায়ন। সীতার সহচরীদের কাছে রাবণের সহ-চররা প্রেম-নিবেদনের অভিনয় করেছিল। এর মধ্যে কিঞ্চিৎ নূতনত্বের আভাস আছে। এল সুগ্রীব ও বানরের দল। রামের সঙ্গে মিতালি ও বালিবধ। রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধও দেখানো হল। রাম লক্ষ্মণ সীতা সহচরী রাবণ ও সন্ন্যাসী ছাড়া অন্যেরা মুখোশ পরেছিল। এদের নৃত্যভঙ্গি খুবই সাধারণ। অভিনেতারা নিজেরাই কথা বলে। যাদের মুখে মুখোশ তারাও কথা বলে। এদের গামেলান-যন্ত্র সংখ্যায় অল্প, সংগীতেও বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, কোনো চরিত্র-বিশেষের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ-প্রস্থানে জাভার মত

কোনো বাঁধাধরা নিয়ম এদের নেই। এবং চরিত্র অনুযায়ী চলন-ভঙ্গিতেও পার্থক্য দেখলাম না। দেখলাম, রামায়ণের সব কটি নারীচরিত্র পুরুষেরাই অভিনয় করল। অথচ এদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচুর। তাদের সমাজজীবনে আর কোথাও স্ত্রী-পুরুষে এ ধরনের ব্যবধান নেই। ভারতে প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে কথাকলি যক্ষগণ বীথিনাটকম্ ইত্যাদিতে দেখেছি নারীচরিত্র পুরুষেরাই অভিনয় করে। প্রায় সব প্রদেশের পুরাতন পদ্ধতির নৃত্যাভিনয় বা গীতাভিনয়ে এখনো এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

জাভার মত বলির প্রাচীন নৃত্যনাট্যগুলিতে প্রধান চরিত্র সর্বদাই বলির প্রাচীন সাহিত্যের ভাষায় কথা কয়। নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের জন্যে সাধারণ চলতি ভাষা। এদের নাচে মুখের ভাবের পরিবর্তন বেশ স্বাভাবিক। চোখে মুখে নানারূপ ভাবপ্রকাশের চেষ্টা তারা করে। জাভাতে তা একেবারেই নেই। শান্ত সমাহিত একটি ভাব নাচের সময় সর্বদা মুখে রাখতে হয়।

আমরা সাধারণত মনে করে থাকি বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে জাভা-বলির নৃত্যাভিনয়ের খুব মিল আছে। যেহেতু ঐ দুই দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ এক সময় ঘটেছিল ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সাহায্যে। এমনকি, অনেকে মনে করেন সেখানকার নাচে কথাকলি বা ভারতনাট্যমের মত মুদ্রার চলনও খুব বেশি।

জাভা-বলির নৃত্যাভিনয় ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত একথা সত্য। তা ছাড়া প্রধানত মহাভারতের গল্পের উপর ভিত্তি করেই তাদের নৃত্য-নাট্যের গল্পাদি রচিত হয়েছে; তবুও সেসব নাটক কথাকলি জাতীয় মুদ্রাভিনয় একেবারেই নয়। কথাকলির মত মুদ্রার ভাষা নিয়ে তারা কোনো কালেই মাথা ঘামায় নি, তাদের নাচের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় থাকলে এবিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। কথাকলিতে গানের প্রত্যেক শব্দকে আঙুলের ভঙ্গি, দেহের ভঙ্গি, হাতের চোখের মুখের ও পায়ের গতির নিয়মে অত্যন্ত পাকা করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

যারা এই ভাষার সঙ্গে পরিচিত, তারা বিনা বাধায় প্রত্যেক ভঙ্গির অর্থ সহজেই বুঝতে পারে। এমনকি, গানের কথা যেখানে নেই, সেখানেও এই মুদ্রার ভাষায় নানাপ্রকার বর্ণনা ইত্যাদি করা হয়। কথাকলিতে দেখেছি যেসব দর্শক সেই মুদ্রার ভাষার সঙ্গে পরিচিত তারা নর্তকের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গির অর্থ সহজেই বুঝে নিচ্ছে। কেবল মূল কয়েকটি মুদ্রা জানলেই হবে না, তারই শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত অন্যূন ছয় শত মুদ্রার ভাষা জানা দরকার। জাভা-বলির নাচ এ ধরনের মুদ্রাভিনয় নয়। ভারতবর্ষ থেকে যে নাচের আদর্শ সে দেশে গিয়েছে তা যে কথাকলি জাতীয় অভিনয় নয় এ কথা স্পষ্ট করে বলা যায়। তাদের নৃত্যে আঙুলের মুদ্রা মাত্র দুটি। যে-কোনো রকমের নৃত্যভঙ্গি বা অভিনয়ে তার পরিবর্তন নেই। এরা হাতে ঐ দুটি মুদ্রা ব্যবহার করে কেবল আঙুলের একটি ছন্দ প্রকাশের জন্যে, কোনো অর্থ এর মধ্যে থাকে না। নৃত্যাভিনয়ে নৃত্যটাই মুখ্য, অভিনয় গৌণ; এমনকি অভিনয় যৎসামান্য। অভিনয়বিহীন ছন্দোবদ্ধ অঙ্গচালনা হল এদের নাচের বিশেষ ধর্ম। মুখের ভাবে হাতের ইঙ্গিতে যে অভিনয়-কৌশলের প্রকাশ তার প্রয়াস এদের মধ্যে দেখি নি। ওদের দেশে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ প্রস্থান ও যুদ্ধ এই তিন বিষয়কে ভিত্তি করেই সমস্ত নৃত্যাভিনয়গুলি গঠিত। এতে তারা যত সময় ব্যয় করে তার সিকিমাত্র সময়ও তারা দেয় না অভিনয়ের জন্যে।

জাভার নৃত্যনাট্যে কথোপকথনের বিষয় এলে অভিনেতারা নৃত্য-ভঙ্গিতে অভিনয় না করে মুখেই কথা বলে। গানবাজনা তখন বন্ধ। এই কথোপকথন অতি সংক্ষেপেই সারা হয়। কথাকে দেহের হাতের ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতে প্রকাশ করার প্রথা নেই। অভিনেতারা আসরের মধ্যস্থলে মুখোমুখি হাত তিন-চার দূরে পা ফাঁক করে সোজা দাঁড়িয়ে, ডান হাত সামনে অপর অভিনেতার দিকে সোজা রেখে কথাগুলি বলে যায়। কথা শেষ হতেই কাঠের পুতুলের মত হাত নেমে আসে। অপর পক্ষ ঠিক একই ঢঙে জবাব দেয়। এই বলার মধ্যে গানের

কোনো স্থর নেই। কথার সাধারণ স্থর। মুখের ভাবেও কোনো পরিবর্তন নেই।

এদের নৃত্যাভিনয়-কালে দেখেছি অভিনেতারা কোনো প্রকার অস্ত্র হাতে মঞ্চে প্রবেশ করে না। যুদ্ধের নাচেও না। কিন্তু যুদ্ধের আগেই অন্য লোকের দ্বারা অস্ত্রগুলি এগিয়ে দেবার রীতি এখানে প্রচলিত। যুদ্ধ শেষ হলে তখনি তা ফিরিয়ে আনা হয়। এ জন্য কয়েকটি লোক নিযুক্ত থাকে সুসজ্জিত দেহে রঙ্গভূমির একপ্রান্তে। তারা যুদ্ধের একটু আগেই অস্ত্রহাতে বিশেষ ও নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে ঠিক সময়টিতে নর্তক বা নর্তকীর হাতে অস্ত্রটি পৌঁছে দেয়, অপেক্ষা করে এবং শেষ হওয়া মাত্রই আবার নর্তক বা নর্তকীর হাত থেকে তা গ্রহণ ক'রে যার যার নির্দিষ্ট-স্থানে ফিরে আসে। এই যাওয়া-আসা, চুপটি করে অপেক্ষা করা, সব মিলিয়ে মনে হবে যেন এও একটি অভিনয়ের অঙ্গ। এই দেওয়া ও ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনো লুকোচুরি নেই; নাচের প্রয়োজনে প্রকাশ্যে এই ভাবে দেওয়া-নেওয়ার কাজ চলে। এই ভঙ্গিটি বিদেশিদের কাছে বেমানান ঠেকলেও ওদের কাছে তার বিশেষ মূল্য আছে। নৃত্যকালে যদি কোনো নর্তক বা নর্তকীর সাজে-পোশাকে কোনো ক্রটি প্রকাশ পেয়েছে দেখা যায় তবে তার জন্যে নাচিয়ে বা দর্শকরা একটুও অস্বস্তি প্রকাশ করে না; কেননা নাচের ব্যাঘাত না করে পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে যে ভাবে যা সংশোধন করা প্রয়োজন তা করে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। এই ভাবে সে দেশের নাচিয়েরা বারে বারে বুঝিয়ে দেয় যে তারা নাচতে দাঁড়িয়েছে, তারা বাস্তবতাকে হুবহু নকল করতে আসে নি। তাদের কাছে নাচের প্রকৃত মর্মার্থ যতখানি সত্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে আমাদের দেশেও তার প্রকাশ ঐ রকমই সত্য ছিল কোনো এক দিন, কিন্তু আমরা সেই পথ থেকে অনেকখানি সরে এসেছি।

# জাভা ও বলির ছায়া-নাটক

জাভা ও বলি দ্বীপে ছায়ানৃত্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত। চিত্ত-বিনোদনের এটি একটি প্রধান উপাদান। এর প্রচলন গ্রামে গ্রামে। সুলতানের প্রাসাদেও এর চর্চা দেখেছি।

যোগজা শহরে প্রথম ছায়া-অভিনয় দেখি সেখানকার এক রাজ-কুমারের প্রাসাদের সমুখে বিরাট পণ্ডপে। রাত্রে সেদিন দু-তিনটে দল ছায়া-নৃত্যাভিনয়ের পরীক্ষা দিচ্ছিল রাজকুমারদের সামনে। দেখলাম, প্রায় আড়াই হাত চওড়া ও পাঁচ হাত লম্বা একটি সাদা চাদর কাঠের ফ্রেমে আটকিয়ে পণ্ডপের ঠিক মাঝখানে দাঁড় করানো। চাদরটির চার পাশে প্রায় দুই ইঞ্চি চওড়া একটি লাল কাপড়ের ফালি সেলাই করা। সেখান থেকে সুতো দিয়ে চাদরটিকে ফ্রেমের সঙ্গে টান করে বাঁধা হয়েছে। পরদাটিকে তারা বলে পেংগুং। মাটি থেকে পরদাটি দুই হাত উপরে। পরদার একদিকে, ঠিক মাঝখানে পদ্মাসনে বসে আছে যে লোকটি, সেই হল পুতুলনাচের মূল খেলোয়াড়। এরা তাকে বলে দালাং, আমাদের ভাষায় যাকে বলা যায় কথক। দালাংএর মাথার উপরে একটি কাঁসার প্রদীপ ঝুলছে। প্রদীপের নাম ব্লেকং। কথকের ঠিক বাঁ দিকে হাঁটুর কাছে একটি প্রকাণ্ড কাঠের সিন্ধুক বা বাক্স রয়েছে, এটিতেই ছায়ানৃত্যের পুতুল ইত্যাদি সব রাখা হয়। এই বাক্সটির গায়ে ঝোলানো কতকগুলি কাঁসার পাত। কথক বসা অবস্থায় ডান পায়ের পাতা দিয়ে তার উপরে ছায়ানৃত্যের নানাপ্রকার ছন্দের ঝোঁকে ঝোঁকে আঘাতে ঝক্‌ঝক্ শব্দ করছে। বাক্সটির নাম কোটক ও কাঁসার পাতগুলি হল কেপ্রাক। দালাং বা কথকের পিছনে আছে গামেলান যন্ত্রগুলি। দালাংএর নির্দেশমত ছায়ানৃত্যে যন্ত্রগুলি যন্ত্রীরা বাজায়। একটানা বাজায় না। কথকের অঙ্গভঙ্গি ও নাচের সময় বাজনা বাজে, কথার সময় নয়। দালাং নৃত্যের চরিত্রের পুতুলগুলির হয়ে নিজেই নানারকম ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কথা বলছিল। যেমন বলছিল রাজার বেলায়

পুরুষোচিত কণ্ঠে আর রানীর বেলায় মেয়েলি স্বরে। গল্পের ঘটনা জায়গার বর্ণনা শ্লোকের মত একটানা স্বরে গেয়ে যাচ্ছিল। পাতলা চামড়ার নকশা-কাটা নানারকমের পুতুল কখনো এক হাতে কখনো দুই হাতে তুলে ধ'রে নাচাচ্ছে, নাড়াচ্ছে, চলার ভঙ্গিতে এপাশ থেকে ওপাশে নিয়ে যাচ্ছে, পুতুলগুলিকে দিয়ে যুদ্ধের ভঙ্গি করাচ্ছে। এসব বিষয়ে দালাংএর দক্ষতা অসাধারণ। দালাংএর গান কথা শ্লোক আবৃত্তি ও গামেলানের ছন্দপ্রধান বাজনা ও ছায়াছবির নানারকম অঙ্গভঙ্গি মিলিয়ে কথা না বুঝতে পারলেও ক্লান্তি বোধ করি নি। পুতুলগুলি মোষের চামড়ায় কাটা।

লক্ষ্য করলাম, পুতুলগুলি নাটকের পাত্রপাত্রী অনুযায়ী সংখ্যায় অনেক। সেগুলিকে দুভাগে ভাগ করে পরদার ঠিক নীচে, দালাংএর দুইদিকে লম্বা করে শোয়ানো, গোটা দু'এক কলাগাছের কাণ্ডের উপর খাড়া করে সাজানো আছে। চামড়ার পুতুলগুলির প্রত্যেকটিই একটি সরু কাঠের ডাণ্ডায় ভালো করে আটকানো এবং নীচের দিকে ডাণ্ডাটি ইঞ্চি ছয়েক বেরিয়ে আছে। সেই হাতলটিই কলাগাছের গায়ে ফুঁড়ে পুতুলগুলিকে খাড়া করে পর পর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এই ডাণ্ডার বের করা অংশটিকে ধরে দালাং পুতুল নাচায়। আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে দালাংএর দুই পাশে দুই সারি পুতুল সাজানোর একটি অর্থ আছে। জাভার আসল নৃত্যনাট্যের মত ডান দিকে গল্পের ন্যায়-পক্ষের পুতুলগুলিকে রাখা হয়েছে, আর বাঁ দিকে অন্যায়-পক্ষকে। বিষয় নেওয়া হয়েছিল মহাভারত থেকে, সুতরাং পুতুলের পাণ্ডবপক্ষ ছিল ডান দিকে, কৌরবদের স্থান বাঁ দিকে।

গল্পের দিক থেকে আমাদের দেশের মহাভারতের সঙ্গে এ দেশের মহাভারতের অনেক তফাত হয়ে গেছে। এখানকার অর্জুন একজন মস্ত বড় বীর, কিন্তু তিনি প্রেমঘটিত ব্যাপারে আমাদের পুরাণ-বর্ণিত মথুরার কৃষ্ণের মতন। এখানকার সব রকম নৃত্যনাট্যের গল্প রচিত হয়েছে কোনো রাজ্যজয় অথবা কোনো সুন্দরী কন্যা হরণের কাহিনী

অবলম্বন করে। বিশেষ করে অর্জুন যেখানে নায়ক সেখানে নারীহরণের কথা থাকবেই। ঐ রাত্রিতেও ছায়ানাটকের গল্পের বিষয় ছিল অর্জুন কর্তৃক শকুনির কন্যাহরণ। অর্জুনের সঙ্গে আরো তিন-চারটি পুতুল সর্বদাই কাছে কাছে ছিল; জানা গেল এরা হল খর্বাকৃতি এক বৃদ্ধ আর তার তিন পুত্র, এরা অর্জুনের ভৃত্য বা সহচর। এই চরিত্রগুলি গল্পে যেদিক গ্রহণ করবে তাদেরই ভালো হবে। এ দেশের পণ্ডিতরা বলেন, এই কটি চরিত্র এ দেশেরই প্রাচীন কোনো গল্প থেকে ঢুকে পড়েছে। পুতুলগুলির চেহারা অন্যদের মত নয়। এরা প্রকৃতপক্ষে নাটকে সব সময় ভাঁড়ের অভিনয় করে। বাংলাদেশের গোপাল ভাঁড়ের মত এদের উপস্থিতবুদ্ধি থাকা চাই। এ দেশের মূল নৃত্যনাট্যেও এই বিদূষকদের খুব বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। সেখানে এদের চলনে-বলনে অঙ্গভঙ্গির কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। নৃত্যনাট্যে যে-কোনো রকমে যে-কোনো ভঙ্গিতে ইচ্ছামত অভিনয় করতে পারে। এদের অভিনয়-পদ্ধতিও বেশ স্বাভাবিক। এদের কাজ হল নাটকের একটানা গম্ভীর আবহাওয়াকে সরস করে তোলা, হাসি ও গল্পে, ঠাট্টায় ও নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গিতে। নৃত্যনাট্যে দেখেছি, এরা যখন আসরে আসে তখন সমগ্র দর্শকমণ্ডলী এদের কথাবার্তায় অঙ্গভঙ্গিতে গানে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। ছায়া-নাটকে এই চরিত্র-কটির কাজও হল তাই। তবে তফাত হল এই যে, এখানে তাদের হয়ে দালাংই সব করে দেয়।

এই বিচিত্র রকমের পুতুলগুলি-রচনার মধ্যেও নিয়ম আছে। আকারে নকশায় বৈচিত্র্যে রঙের ব্যবহারে পুতুলগুলির বিভিন্ন চরিত্র ধরা পড়ে। সাধারণত প্রধান চরিত্রের গলায় কোনো গয়না থাকে না, কিন্তু অভিনয়-কালে পুতুলের কোমরের কাছে সাদাফুলের একটি মালা লাগিয়ে দেয়। দেখছিলাম, পুতুলগুলির হাত-পা নড়ছিল কিন্তু মুখ নড়ছিল না।

দর্শকরা দু ভাগে বসেছিল। দালাং পরদার যেদিকে বসেছিল, পুরুষ দর্শকেরা ছিল সেইদিকে। আর ছায়ার দিকে বসে ছিল সব মেয়েরা। শুনলাম, জাভায় নাকি এইটেই নিয়ম।

বলির ছায়ানৃত্য জাভার মতনই। সামান্য কিছু তফাত আছে। পুতুলগুলির আকৃতি ভিন্নরকমের। বলির পুতুলগুলির আকৃতি বেশ জোরালো, জাভার পুতুলগুলিতে লালিত্য অপেক্ষাকৃত বেশি। মেয়েপুরুষ সব দর্শকই ছায়ার দিকে বসে। ছায়া-অভিনয়ের পূর্বে দালাং আনুষ্ঠানিক ভাবে একটা পুজোও করে। ছায়ার পরদাকে বলে ক্লিন। কলাগাছকে বলে গেডেবং। প্রদীপকে বলে দামার। পুতুলের বাক্সকে বলে ক্রোপাক। দালাংএর সহকারী থাকে দুজন; দুপাশের পুতুলগুলি সময়মত দালাংএর দুই হাতে এগিয়ে দেয়।

জাভা বা বলি ছায়া-অভিনয়ে বিচিত্র নকশা-কাটা অশ্বত্থ পাতার আকারে বেশ বড় চামড়ার কাটা একটি জিনিস বিশেষভাবে সকলের চোখে পড়ে। এটি ছায়া-নাটকের একটি অতিপ্রয়োজনীয় জিনিস। ওদের ভাষায় এর নাম কায়োনান্ বা কায়োন্। এটিকে বলা হয় ছায়া-অভিনয়ের গাছ। বাতাস অগ্নি ও জলের জন্য এরই সাহায্য নিতে হয়। এটিকে ঢেউয়ের মত দোলালে অস্থিরতা প্রকাশ পায়। এক দৃশ্য থেকে আর-এক দৃশ্যে যাবার সময় এটিকে একবার দেখাতে হয়। এটিকে পরদার মাঝখানে রাখলে বোঝায় গল্পের আরম্ভ বা শেষ। এটিকে আগে পরদার সামনে কলাগাছে আটকিয়ে তবে অন্য মূর্তিগুলিকে বের করতে হয়। এটির বিভিন্ন ব্যবহারে বিভিন্ন রকমের নিয়ম প্রকাশ পায়।

বলির পুতুলগুলি কথা বলার সময় মুখ নাড়তে পারে, কারণ পুতুলের মুখের চোয়াল হাত-পায়ের মত আলাদাভাবে আটকানো।

একসময় সাধারণ শিক্ষার পথে এই পুতুলাভিনয় জনসাধারণের বিশেষ উপকার করেছে। আমাদের দেশের কথকদের মত দালাংরা ওদেশে জনশিক্ষার বাহক। দালাংরা চিরকালই খুব বুদ্ধি রাখে এবং কথাবার্তায় সুচতুর। তাদের গান ও কথাই হল ছায়াভিনয়ের আসল বস্তু। তারা তাদের গান এবং কথার মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের নিয়ে ইচ্ছামত ঠাট্টা-তামাশা করে। দুঃখিত হলেও কেউ তাদের কিছু বলে না। ঠাট্টার ভয়ে সকলেই তাদের সমীহ করে।

সেদেশবাসী অনেকের মুখে এই ছায়া-নাটকের বিষয়ে একটা গর্ব প্রকাশ পেত এই বলে যে, তাদের ধারণা মূলত এই অভিনয় ভারত থেকে আসে নি। এটা তাদেরই দেশের জিনিস। তারা জানে ভারতে এ জিনিস নেই। কিন্তু জানে না দক্ষিণভারতে কয়েকটি জায়গায় ছায়া-নৃত্যাভিনয় আজও প্রচলিত, এমনকি চামড়ার পুতুলগুলিও একই ধরনে তৈরি। মোষের চামড়ার চ্যাপটা পুতুল। জাভায় এর নাম ওয়াংয়াং কুলিত, দক্ষিণভারতে বলে বম্মলাত।

## গামেলান-সংগীত

জাভায় যোগজার স্থলতানের বিচিত্র এবং বহু সংখ্যক গামেলান-যন্ত্রের মধুর শব্দের সঙ্গে পুরুষ ও নারী কণ্ঠের গান শুনে প্রথমেই মনে হয়েছিল যেন আমি একটি বিরাট সুরের জগতে প্রবেশ করলাম; মনে হল জগতের সব সংগীত একটা অপূর্ব সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে এক অপার্থিব সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করেছে। আবার তারই সঙ্গে মাঝে মাঝে নারী-কণ্ঠের সুমধুর সুস্পষ্ট সুর ও পুরুষকণ্ঠের স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরের গানের ভিতর দিয়ে এ জগতের মানুষের কণ্ঠও নিজ শক্তি অনুযায়ী সেই সংগীতে আপনার স্থান গ্রহণ করেছে। সেই সমবেত স্বরলহরী একটি বিরাট সংগীতে পরিণত হয়ে অনির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে উত্থিত হচ্ছিল একটি বন্দনা-গানের মত। বাইরে থেকে মনে হবে এ সংগীত আশ্চর্যরকম গম্ভীর ধীর স্থির ও বিরাট। কিন্তু তার অন্তর-লোকে কত বৈচিত্র্যময় ছন্দ, কত সুরের ঝংকার। এই রকম সুরের আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে অচঞ্চল ধীর গতি, দোলায়িত ছন্দ, আধ-বোজা অবনত দৃষ্টি ও শান্ত গম্ভীরভাব মুখে রেখে মেয়েরা তাদের দেহের, হাতের, মাথার সাবলীল ভঙ্গিতে নেচে চলে। নাচের সঙ্গে যে গান শুনেছি তার অর্থ বুঝি নি, কিন্তু আপনা হতেই এ নাচের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এসেছে।

এই গামেলান-সংগীতের বিষয়ে একটি পৌরাণিক গল্প আছে। গল্পটির কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই, তবুও এর ভিতর দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটিতে আছে ভগবান বাতারাগুরু একবার স্বর্গের একঘেয়ে জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বৈচিত্র্যের দরকার, তখন ভেবে চিন্তে কতগুলি যন্ত্রের সৃষ্টি করলেন যা আগে কেউ দেখে নি বা শোনে নি। এবং সেই যন্ত্রের ঝংকারে স্বর্গের দেবতারা সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

বাজিয়েদের কাছে শুনলাম একটি পূর্ণাঙ্গ অর্কেস্ট্রা রচনা করতে হলে যতগুলি গামেলান-যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তার পূর্ণসংখ্যা কেবলমাত্র এই স্থলতানের প্রাসাদেই আছে। এত যন্ত্র সংগ্রহ করা একমাত্র স্থলতানের পক্ষেই সম্ভব।

প্রথম অপরিচিত কানে এই সংগীত শুনে কিছু ঠিক পাওয়া যায় না, মনে হবে বাজবার যেন কোনো নিয়ম নেই। অথচ শুনতেও খারাপ লাগে না, তালে ছন্দে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ করলে ধরা পড়ে এর কঠিন নিয়মজাল।

পৃথকভাবে দেখলে দেখা যাবে, জাভার কণ্ঠসংগীতের চেয়ে জাভার যন্ত্রসংগীতে জাঁকজমক বেশি। এবং নৃত্যের সঙ্গে এই গামেলান-সংগীতের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। আবার গানের ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসাবেও খুব উপযুক্ত। নাচের সঙ্গে গামেলান-সংগীতের মিল হবার কারণ, নাচের মূল তালের সঙ্গে বাজনার মূল তাল সব সময়েই এক। কী গল্পের ভাব নিয়ে নাচটি গঠিত সে কথা গায়ক ও গায়িকারা তাদের কণ্ঠসংগীতে শ্রোতাদের শুনিয়ে থাকে। এদের কোনো নাচের ভঙ্গিই হুবহু গানের কথা লক্ষ্য করে একসঙ্গে চলে না। গাইয়েরা কথায় ও গানের স্বরে শ্রোতাদের শোনাচ্ছে সমস্ত গল্পটা, তার যাবতীয় ঘটনা এবং বর্ণনা সহ। সুতরাং সামনের নাচের অভিনয়ের সঙ্গে বাকি সব কল্পনায় মিশিয়ে এর সমগ্র রূপটি মনে মনে তৈরি করে নিতে হয়।

নাচের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে নাচের গানগুলি বাঁধা। গান ও নাচ

একসঙ্গে শুরু হবে, শেষও হবে একসঙ্গে। এক-একটা নাচ এ দেশে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট সময় নেয়।

কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে যখন গামেলান-সংগীত বাজে তখন উভয়েই একই রাগিণী ব্যবহার করে। কিন্তু দুয়ের চলন সম্পূর্ণ পৃথক। কণ্ঠ-সংগীত কখনো যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে তৈরি নয়। আমাদের কোনো রাগিণীর গৎ যখন ঐকতানে বাজে, তখন যদি সেই রাগিণীতে একটি ঢিমা লয়ের টানা সুরের গান গেয়ে কেবল সমে এসে গতের সঙ্গে মিলিয়ে দিই, তাহলে যা দাঁড়ায়, ওদের যন্ত্রসংগীতে ও কণ্ঠসংগীতে পরস্পরের সম্পর্ক সেই প্রকারের। ওদের কণ্ঠসংগীতের ধরন আমাদের দেশের সাম্প্রতিক অতিপ্রচলিত হিন্দুস্থানী ঢিমা লয়ের খেয়াল গানের মত, তান-কর্তব ও নানাপ্রকার দুরূহ কারুকার্য ছাড়া। অথবা বাংলা-দেশের বড়তালের কীর্তন গানের মত।

কণ্ঠসংগীত কতখানি স্বেচ্ছায় চলে তার আরো কয়েকটি উদাহরণ দিই।

অনেক সময় গানের একই অংশ অনেকবার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তখন একদল গাইয়ে গানের প্রথম লাইন থেকে গান শুরু ক'রে যেই দ্বিতীয় লাইনে পৌঁছল তখন আরো একদল অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে প্রথম লাইন থেকে গান শুরু করে। পরে উভয় লাইনই গামেলান-সংগীতের গতের শেষে সুরে এসে মিশে যাবে। কখনো একটি কণ্ঠ খুব উঁচু সুরে গান আরম্ভ করে সমবেত কণ্ঠের সঙ্গে এক জায়গায় এসে মিশে গেল, কিন্তু আরম্ভে সমবেত কণ্ঠের সুর ছিল অন্যখানে। এই পদ্ধতির সঙ্গে ইয়োরোপের কণ্ঠসংগীতের মিল দেখা যায়। আমাদের মত বিদেশির মনও এই সংগীতের মেলডির পরিপূর্ণতায় গভীর শান্তির আভাস পায় এবং সব যন্ত্র একসাথে মিলে একটা বিরাট অনির্বচনীয় সংগীতে রূপ নেয়।

গানের এই প্রথার কথা শুনে হয়তো অনেকেই ভাবছেন এ ধরনের সংগীত শ্রুতিমধুর হয় কী করে। কথার অর্থের দিক দিয়ে কোনো অসু-বিধা তারা যে বোধ করে না তা তাদের গান গাওয়ার ধরন দেখেই

বোঝা যায়। তা ছাড়া কেবল পুনরুক্তির সময়েই এই রকমে গান গায়। আমাদের হিন্দী গানের সঙ্গে তানপুরার যে সম্বন্ধ ওদেশে কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে গামেলান-সংগীতের ঠিক সেই সম্বন্ধ। গামেলান-সংগীত ঠিক তানপুরার মতনই কাজ করে।

জাভার নৃত্য যদিও মূলত গামেলান-সংগীতের তালে চলে তবুও সে ঢোলের বাজনারই অনুগত। প্রায়ই দেখা যায় ঢোলের ছন্দবৈচিত্র্যের সঙ্গে মিল রেখে নাচিয়ে নিজের পায়ের হাতের ও দেহের ছন্দকে ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু গামেলান-সংগীত তার মূল ছন্দের ব্যতিক্রম করে না। ঢোলের তাল সমে এসে গতের সঙ্গে মিলে যায়।

জাভার সংগীতশাস্ত্রে রাগিণী মাত্র তিনটি ও তাল একটি। ওদের ভাষায় এর নাম শ্লেন্‌ড্রো, পেলক ও মিরিগ। তাল চার মাত্রার, খুব ঢিমা লয়ের। আর কোনো তাল, এমনকি দাদরা তালও ওদেশি সংগীতে নেই। শ্লেন্‌ড্রো রাগিণীটি ঠিক আমাদের দেশের ভূপালী রাগের মত। একটুও তফাত নেই। সা রে গা পা ধা সা, এই কয়টি স্বরের উপর এ রাগিণীটি চলাফেরা করে। গাইয়েদের গলা খাদের দিকে খুবই যায়, প্রায় ৰা পর্যন্ত, এবং গানের সময় গলার স্বরের ওঠা-নামার কায়দাও আকস্মিক। নীচে একটি গতের নমুনা দিলাম—

II পা গা পা ৰা । পা গা ৰা সা I
I ৰা সা ৰা গা । সা পা গা রে I
I পা ধা পা গা । ৰা সা ৰা গা I
I ধা পা গা ৰা । পা গা ৰা সা II

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য যখন সমস্ত জাভা-সুমাত্রায় বিস্তৃত হয়, তখন এই সুরটি ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে সে দেশে আমদানি হয়। এবং সেই শৈলেন্দ্র নামেই এই সুরটি প্রচলিত হয়ে আজকাল শ্লেন্‌ড্রো নামে ঠেকেছে। এই মত কতখানি সত্যি ঐতিহাসিকরা তার সঠিক বিচার করতে পারবেন।

পেলগ সুরে আছে দুটি ভাগ, একটির নাম পেলগ্‌বম্ অপরটির নাম

পেলগ্‌বারাং। এ দুটি শুনতে সকালের রাগিণীর মত, পল্লীগীতির স্বরের আমেজ এতে পাওয়া যায়। এতে সব সমেত সাতটি স্বর ব্যবহৃত হয়। পেলগ্‌বম্‌ স্বর সা ঋা জ্ঞা পা দা ণা, কোমল নি পর্যন্ত এর সীমানা। উঁচু তারা সপ্তকে স্বর যায়, কিন্তু পা দা ণা র্সা এভাবে কখনো স্বর ওঠে না। এখানে একটু বলা প্রয়োজন, এই রাগিণীর কোমল রে সাধারণত কোমল রে ও কোমল গা স্বরের মাঝামাঝি একটি শ্রুতি। কখনো শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু মধ্যম স্বরটি গান্ধার ও মধ্যমের মাঝখানের একটি শ্রুতি। পেলগ্‌বম্‌ স্বরের একটি নমুনা নীচে দিচ্ছি—

II ঋা সা ঋা জ্ঞা । ঋা সা ঋা দা I

I ঋা সা ঋা জ্ঞা । পা দা ঋা ঋা I

I ។ জ্ঞা ។ জ্ঞা ; পা দা ণা দা I

I ণা ঋা ণা দা । জ্ঞা পা জ্ঞা ঋা II

কখনো শুদ্ধমধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে এইভাবে : পা দা পা মা ঋা জ্ঞা।

পেলগ্‌বারাং স্বরটি উপরের রাগিণীরই মত কিন্তু শুদ্ধমধ্যম ও কোমল নিখাদ বর্জিত। কোমল ধৈবত থেকে স্বর এক লাফে উঁচু সা -তে গিয়ে দাঁড়ায়।

অনেকের মতে এই রাগিণী শুদ্ধঠাটের, যথা গা মা পা না র্সা অথবা গা মা পা না র্গা। এভাবে গাইলে শুনতে হবে আমাদের কড়ি মা বর্জিত বেহাগের মত। আর বাদী-স্বর হবে মা। আমাদের দেশি বেহাগ স্বরে যাদের কান তৈরি, তাদের কাছে মনে হবে কেন গা-তে এসে থামল না, কেন কেবল মা-তে থাকে। কিন্তু এভাবে জাভা ও বলির সংগীতজ্ঞরা কখনো তাদের স্বরের বিচার করেন না, তাঁরা বলেন প্রথম স্বরই সেই রাগিণীর স্কেল বা সা।

বিচার করলে দেখা যায় যে, গা মা পা না র্সা অথবা গা মা পা না র্গা এই কয়টি শুদ্ধস্বরের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যে ব্যবধান বা পার্থক্য, সা ঋা জ্ঞা পা দা ণা অথবা সা ঋা জ্ঞা পা দা র্সা স্বরেরও সেই পার্থক্য বা ব্যবধান। উভয়েরই স্বরের রূপ বা আকৃতি দাঁড়ায় একই প্রকার।

রাগিণী কয়টির আলাদা নাম থাকা সত্ত্বেও একই রাগিণীর বিভিন্ন গানের আলাদা নাম থাকে, যেমন শ্লেন্‌ড্রো রাগিণীতে আমরা পাই কতগুলি নাম : পুষ্পবর্ণা, ক্রবিতান, শিদামুক্তি, চন্দ্রা ইত্যাদি। গান-রচনার তারতম্যের উপর এ নামগুলি নির্ভর করে। আমাদের দেশে প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে বিভিন্ন ছন্দের আমরা যেমন বিভিন্ন নাম পাই, এগুলিও মনে হল সেই ধরনের কবিতার ছন্দের নাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, খুব কম গাইয়েই দেখেছি যারা এবিষয়ে সঠিক বুঝিয়ে বলতে পারে। অধিকাংশ গায়কের মত গানের বিভিন্ন গঠন-পদ্ধতি লক্ষ্য করে এই নামগুলি দেওয়া হয়েছে।

মিরিগ স্বরটি সে দেশের ছায়া-নাটকে অথবা নৃত্যনাট্যে কথকরা ব্যবহার করে, যখন তারা স্বর করে গল্প বলে যায়। এটি ভৈঁরো ও ভৈরবী মিশ্রিত একটি স্বর, খুব সহজ ও সাধারণ।

এই তিনটি রাগিণীর জন্যে তিনটি আলাদা যন্ত্র রাখতে হয়। বাজনা-গুলি তৈরির মধ্যেও একটু পার্থক্য আছে। একই স্বর থেকে এই তিনটি রাগিণীর স্বরগুলি আরম্ভ হয় নি। যেমন শ্লেন্‌ড্রো রাগিণীর যে সা, পেলক রাগিণীর সা থেকে সেটি আধ স্বর উঁচুতে থাকে। সর্বত্র এই নিয়মে গামেলান-যন্ত্রগুলি তৈরি দেখে একটু আশ্চর্য লাগল।

ও দেশের গামেলান-যন্ত্রকে ওরা সব-সমেত চার ভাগে ভাগ করেছে। প্রথম ভাগে ওরা রেখেছে কানড়াং ও কাপড়াক, অর্থাৎ কাঠের তৈরি চামড়ার ঢোল এবং চৌকো ও ভিতর-ফাঁপা একটি একহাত লম্বা কাঠ। ঢোল বাজে আমাদের দেশের ঢোলের মত হাতের আঙুলে। আর কাপড়াক বাজে ছোট একটি কাঠের হাতুড়ি দিয়ে। ঠক্‌ঠক্ শব্দে নানা প্রকার ছন্দ তোলাই কাপড়াকের কাজ। যে এ দেশের নাচ ভালো করে আয়ত্ত করে নি তার পক্ষে এ বাজনাটি বাজানো শক্ত। কারণ এই শব্দ নাচিয়েকে ইঙ্গিত করে কোথায় ভঙ্গির পরিবর্তন, ওঠা-সবা, চলা-ফেরা, আরম্ভ ও শেষ। প্রতি ভঙ্গির ঝোঁকের সঙ্গে এই কাপড়াক বাজনাটির শব্দের মিল খুবই স্বন্দর। ঢোলের তালের সঙ্গে নানাভাবে ছন্দ তুলে

শব্দ করে। টেলিগ্রাফের টক্‌টক্‌ শব্দের মত প্রত্যেক শব্দের একটা অর্থ আছে নাচিয়েরা প্রত্যেকে জানে এবং বুঝতে পারে। যারা এ নাচ জানে না তাদের কাছেও ছন্দে কাঠের শব্দটার আকর্ষণ আছে।

দ্বিতীয় দলের যন্ত্রের কাজ হল গং বাজানো। এই দলের যন্ত্রের সংখ্যা সাত। যন্ত্রগুলির নাম ১. শারন ২. বোনাং (একটি নীচু সপ্তকের, অপরটি উঁচু সপ্তকের) ৩. গেন্‌ডার (একটি নীচু সপ্তকের, অপরটি উঁচু সপ্তকের) ৪. গামবাং ৫. চালেম্‌পুং ৬. রবাব ৭. স্লিং।

সব যন্ত্রই শ্লেন্‌দ্রো ও পেলক স্বরের ঠাটে দুই সেট করে তৈরি রাখতে হয়।

সংক্ষেপে বাজনাগুলির একটু পরিচয় দিই। শারন নামে যন্ত্রটি তৈরি কাঁসার মোটা পাতে। কাঠের ফ্রেমে পর পর সাজানো। পাতগুলি প্রায় এক বিঘৎ লম্বা। স্বরের উঁচু-নীচুর সঙ্গে মিলিয়ে ক্রমে ছোট ও পাতলা হয়ে যায়। বাজাতে হয় ডান হাতে, ছোট কাঠের হাতুড়ি দিয়ে। ডান হাতের হাতুড়ি দিয়ে এক স্বরে আঘাত করে অপর স্বরে আঘাত করার সঙ্গেসঙ্গেই বাঁ হাতে এই স্বরটিকে থামিয়ে দিতে হয়। যেমন সা স্বরে আঘাত করে পরের রে স্বরে আঘাত করা মাত্র সা স্বরকে বাঁ হাতে থামাতে হয়।

বোনাং যন্ত্রটি কাঁসার কতগুলি ছোট ঘণ্টার সমষ্টি। দুই সপ্তক স্বর কাঠের ফ্রেমে সাজানো থাকে। এক সপ্তক থাকে উপরে, আর-এক সপ্তক থাকে নীচে। কাঠের ফ্রেমে দড়ির উপরে উপুড় করে সাজানো। বাজিয়ের দুই হাতে থাকে দুটি কাঠের ডাণ্ডা, তার মাথা দড়িতে মোড়া থাকে। তাতে কাঁসার কর্কশ শব্দ থেকে রেহাই দেয় ও নরম স্বর বেরোয়। ডাণ্ডা দিয়ে চাপ দিয়ে আঘাত করাই এর প্রথা। আঘাত করেই ডাণ্ডাটি তুলে নেয় না। বাজানোর লয় উপরের যন্ত্রটির চেয়ে দ্রুত। যন্ত্রসংগীতে জ্ঞান খুব পাকা থাকলে তবে এ যন্ত্র ঠিক করে বাজানো চলে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে নানা প্রকার ছন্দ তোলা যায়।

গেন্‌ডার যন্ত্রটি এক বিঘৎ লম্বা ও প্রায় চার আঙুল চওড়া কাঁসার

পাতের। প্রত্যেকটি কাঁসার পাতের নীচে একটি করে বাঁশের চোঙ থাকে। সেগুলিও কাঁসার পাতের সুরে সুর মিলিয়ে কাটা। বাঁশের চোঙগুলি ব্যবহারের দরুন শব্দবহন-ক্ষমতা বেড়েছে অনেক ও সুর অনেকখানি গম্ভীর। বাঁশের চোঙগুলি কাঠের ফ্রেমে যুক্ত থাকে। একটি আট আঙুল লম্বা সরু কাঠের ডাণ্ডার মাথায় কাঠের একটি চাকতি লাগানো হাতল। চাকতির ধার মোটা কাপড়ে আঠা দিয়ে মোড়া। এ যন্ত্রের শব্দ মৃদু ও নরম। সব-সমেত আড়াই সপ্তক সুর এ যন্ত্রটিতে থাকে। বাজানোর পদ্ধতি বোনাং যন্ত্রের মত। দ্রুত লয়ে বাজে।

গামবাং যন্ত্রটি হল কাঠ তরঙ্গ। কাঠগুলি পর পর প্রায় তিন সপ্তকের উপর পর্যন্ত বড় থেকে ছোট এক সারিতে সাজানো। দুই হাতে গেন্ডার বাজনার মত দুটি হাতল ব্যবহার করে, ডাণ্ডাটি অপেক্ষাকৃত লম্বা।

চালেমপুং যন্ত্রটি বিলিতি হার্প যন্ত্রের মত বহু তার-বিশিষ্ট তারের যন্ত্র, বাজায় দুই হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে।

রবাব যন্ত্রটি একতারের পারশিক যন্ত্র, ঘোড়ার ল্যাজে তৈরি ছড়ের টানে বাজে। কোনো পরদা নেই, বাঁ হাতে আঙুলের স্পর্শে নানা সুর বেজে ওঠে। এটি কেবলমাত্র কণ্ঠসংগীতের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়— আমাদের দেশে আমরা যেমন সারেঙ্গী বা এস্রাজ ব্যবহার করি।

সুলিং হল বাঁশের বাঁশি। তৃতীয় দলের যন্ত্রগুলি উপরোক্ত দ্বিতীয় দলের যন্ত্রেরই মত, কিন্তু উদারা সুরের এক সপ্তক সুরই কেবল তাতে থাকে। এই যন্ত্রগুলির কাজ হল সুরে রেশ রাখা, গতের প্রতি চার বা আট মাত্রায় যে সুর আসছে সেইটিতেই কেবল আঘাত করা। এইগুলির নাম শারনপেনেম্বুং, শেন্থান, বোনাংপেনেম্বুং ও গেণ্ডারপেনেম্বুং। কোনো যন্ত্রই এরা পিটিয়ে জোর শব্দে বাজায় না, যতটুকু অল্প আঘাতে শব্দ উঠতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখে বেশি। ঘণ্টা বা কাঁসার পাতের যন্ত্রগুলির স্বভাবতই সুর-বহনের ক্ষমতা বেশি ; কিন্তু বাজিয়েরা সেই সুরকে সব সময়ই হাতে থামিয়ে দেয় তবুও তার ভিতর দিয়েও একটা সুরের রেশ থেকে যায়।

মূলে এদের বাজনার উদ্দেশ্য হল স্বরের ছন্দ বিস্তার করা। আমাদের জলতরঙ্গ বা নলতরঙ্গকে আমরা যদি গতের মত না বাজিয়ে কেবল তবলার বোলের মত নানা ছন্দ তুলে বাজাই, তাহলে যা হয় ঠিক তাই। এ দেশের যন্ত্রসংগীতের এটিই হল বৈশিষ্ট্য। একই তালে নানা বিচিত্র ছন্দ তোলে, ও তার ভিতর প্রশংসনীয় অনেক কিছু কারুকার্য দেখা যায়।

চতুর্থ দলের যন্ত্রগুলি হল নানা আকারের ও বিভিন্ন পরদার স্বরে তৈরি কতগুলি ঘণ্টা। এগুলির নাম হল কেথুক, কেম্পল, কেনং, ও গং। প্রতি দুই ও ছয় মাত্রায় কেথুক নামে ঘণ্টাটি, প্রতি চার মাত্রায় কেম্পল ঘণ্টা ও প্রত্যেক আট মাত্রায় কেনং নামে ঘণ্টাটি বাজবে। সম্পূর্ণ গতের শেষ মাত্রায় বাজে বৃহৎ ঘণ্টা গং—গুরুগম্ভীর স্বরে।

আমাদের দেশে তালের ঝোঁক সব সময় আসে এক মাত্রা, তিন মাত্রা, পাঁচ কিম্বা সাত মাত্রায় এবং সম আমরা দিই সব সময় তালের প্রথম মাত্রায়। জাভার সংগীতে ঝোঁক আসে প্রতি দুই মাত্রা, চার মাত্রা, ছয় মাত্রা ও আট মাত্রায় এবং এরা তালের সম দেখাবে সব সময় গতের শেষ মাত্রায়। আমরা ত্রিতালের সম দেখাই তালের প্রথম মাত্রায়, কিন্তু ওদের মতে সম পড়বে ত্রিতালের ষোলো মাত্রায়। নীচে একটি ছোট শ্লেন্‌ড্রো রাগিণীর গৎ উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি কখন কোন্ ঘণ্টাটি বাজছে এবং কখন ঝোঁক পড়ছে, তা হলে বুঝতে সহজ হবে —

| | কেথুক | | | কেম্‌পল্ | | | কেথুক | | | কেনং | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | |
| II | ধা | রা | । | পা | গা | । | ধা | র্সা | । | ধা | পা | |
| | ধা | রা | । | পা | গা | । | ধা | র্সা | । | ধা | পা | |
| | ধা | গা | । | পা | গা | । | রা | গা | । | রা | সা | |
| | গা | রা | । | সা | ধা | । | রা | পা | । | ধা | পা | II |
| | | | | | | | | | | | ↓ | |
| | | | | | | | | | | | গং | |

অনেকে হয়তো ভাবছেন এদের যন্ত্রসংগীত বুঝি আমাদের দেশের প্রচলিত ঐকতান-সংগীতের মত। কিন্তু তা নয়, মূল গতের সঙ্গে ঠিক রেখে এদের এক-একটি যন্ত্র বাজে এক নিয়মে। যার যেখানে, যত মাত্রায় বা যে নিয়মে যে যন্ত্রটি বাজানোর কথা সে কেবল সেইটুকু নিয়েই নিশ্চিন্ত। ঢোলের ও কাপরার্এর শব্দের সঙ্গে তাল ঠিক রেখে গেলেই হল এবং এই দুইটি যন্ত্রই আসলে যন্ত্রসংগীতের কর্ণধার।

এদের তিনটি প্রধান যন্ত্র একসঙ্গে যে প্রথায় ব্যবহৃত হয় নীচে তার নমুনা লিখে দেখাচ্ছি। একটি গতের প্রথম লাইন শারন যন্ত্রে বাজছে এই নিয়মে—

-া ধা -া। রা -া পা -া। গা -া ধা -া। র্সা -া ধা -া। পা

এর সঙ্গে বোনাং ও গেন্ডার যন্ত্রটি বাজছে—

া ধা া। রা া পা া। গা া ধা া। র্সা া ধা া। পা → শারন
রা রা রা। া গা গা গা। া র্সা র্সা র্সা। া পা পা পা। া → গেন্ডার
ধা রা ধা। রা পা গা পা। গা ধা র্সা ধা। র্সা ধা পা ধা। পা → বোনাং

এবং এরই প্রতি দুই চার ছয় আট মাত্রা ও শেষ স্বরে ঘণ্টাগুলি বাজে।

এইবার সংক্ষেপে বলির যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীত নিয়ে আলোচনা করব। যদিও এই দুই দেশ পাশাপাশি অবস্থিত এবং প্রাচীনকালে এক ধর্ম ও একই সংস্কৃতির বাহন ছিল উভয়েই, তবুও বর্তমানে এদের দুই দেশের মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক। সংগীতেও তার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

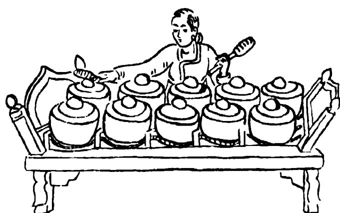
জাভার কণ্ঠসংগীত শুনতে ভালো; কিন্তু বলির কণ্ঠসংগীত আলাদা করে শুনতে ভালো মনে হয় নি। এদের নৃত্যাভিনয়ের গানগুলি শুনে মনে হবে ঠিক যেন কথা বলে যাচ্ছে একটানা একঘেয়ে স্বরে, অনেকটা আমাদের দেশের পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠের মত। গামেলান-যন্ত্র সম্মিলনে কখনো এদের গান গাইতে দেখা যায় না, যে রকম আমরা

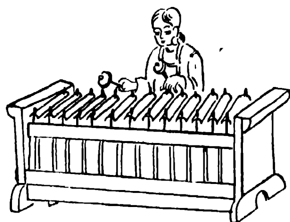
জাভাতে পাই। বলি যন্ত্রসংগীতের প্রতি নজর দিয়েছে বেশি, নৃত্যকলাকে লক্ষ্য করে, নতুন নতুন রচনার ভিতর দিয়ে তারা তাদের যন্ত্রসংগীতে বৈচিত্র্য এনেছে। কিন্তু জাভা এসব দিক থেকে প্রাচীনপন্থী, তারা পুরাতন পদ্ধতিকেই পছন্দ করে বেশি। কণ্ঠসংগীতের প্রতি বলি কেন একেবারেই নজর দেয় না সেটাই আমার কাছে আশ্চর্য মনে হল।

বলির যন্ত্রসংগীতের সুর বা রাগিণী একটি, তালও একটি। রাগিণীটি অবিকল জাভার পেলগ্‌বম্‌ সুরের মত, কেবল এদের বাজনার লয় খুব দ্রুত, জাভার বাজনার লয় অতি ধীর। বলি সংগীতে এক লয়ে চলতে চলতে ক্রমাগত নানা রকমে লয়ের বদল করে। কখনো ঢিমা লয় থেকে দ্রুত লয়ে, দ্রুত থেকে ঢিমাতে। দ্রুত লয়ে সশব্দে চলতে চলতে সহসা নিস্তব্ধ, একটু পরেই মৃদু ধ্বনিতে নানা বিচিত্র সুরের ছন্দে বাজতে থাকে রেয়ং ও গাংসাজংকং নামে দুটি যন্ত্রে। তখন ঢোল ও করতালের শব্দ অতি মৃদু হয়ে আসে। এই ভাবে বদল করে বাজাবার প্রথার দরুন যন্ত্রসংগীতের একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাওয়া যায় ও শুনে আরাম বোধ হয়। জাভার সংগীতে এই রকমের লয়ের বা ছন্দের বৈচিত্র্য নেই, যা আছে তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। লয় বদলের কাজে বলির বাজিয়েদের হাত অতি নিখুঁতভাবে তৈরি, একটুও গোলমাল হতে দেখা যায় না। তাল চার মাত্রার, জাভার সঙ্গে কোনো তফাত নেই। এদের যন্ত্রগুলির নাম ক্যানাডাং, চংচং, গাংসা জংকং, গাংসা গানটুং, রেয়ং, সুলিং ও রবাব।

ক্যানাডাং নামটি হল ওদের চামড়ার ঢোলের। এই ঢোলে হাত চালনার কায়দা আমাদের দেশের ঢোলেরই মত, দ্রুত লয়ে নানাপ্রকার তাল ছন্দ তুলতে এরা পটু। এদিকে জাভার বাজনা অনেক কাঁচা। তারা বাজাবার সময় একটি বড় ও একটি ছোট ঢোল একসঙ্গে সামনা-সামনি সাজিয়ে নিয়ে বসে। তার কারণ মনে হয় ঢিমা লয়ে এরা একটি ঢোলে নানাপ্রকার ছন্দ তুলতে পারে না। জাভার ঢোলের শব্দের নাম হল পাঁচটি, যথা ডাং, ডুং, পাক্‌, টং, ট্যাক্‌। ডাং ও ডুং শব্দ দুটি এরা

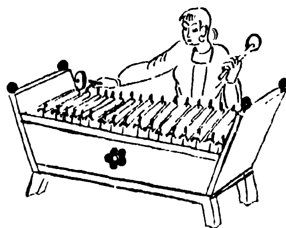
জাভার বোনাং যন্ত্র। কাঁসার কতকগুলি ছোট ঘণ্টার সমষ্টি। উপরে ও নীচে দুই সপ্তক সুর কাঠের ফ্রেমে দড়ির উপর উপুড় ক'রে সাজানো।

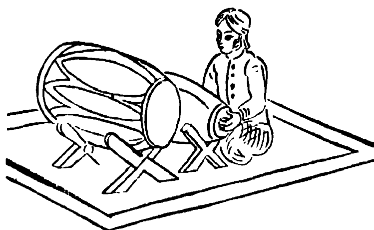




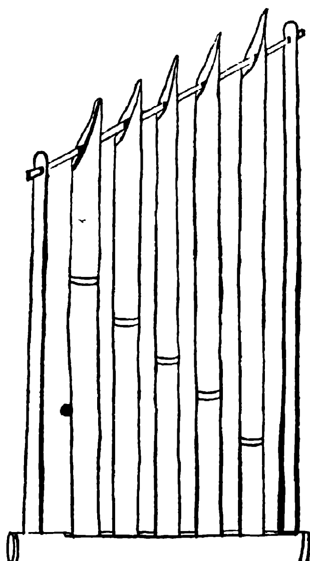
জাভার গেন্‌ডার যন্ত্র। এক বিঘৎ লম্বা ও প্রায় চার আঙুল চওড়া কাঁসার পাত দিয়ে তৈরি। প্রত্যেক পাতের নীচে একটি ক'রে বাঁশের চোঙ।

জাভার কাঠতরঙ্গ গামবাং। কাঠগুলি পর পর প্রায় তিন সপ্তকের উপর পর্যন্ত বড় থেকে ছোট এক সারিতে সাজানো।

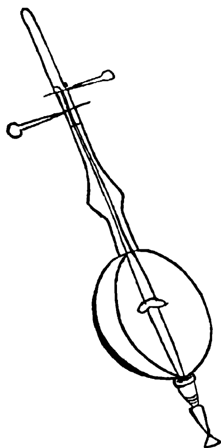




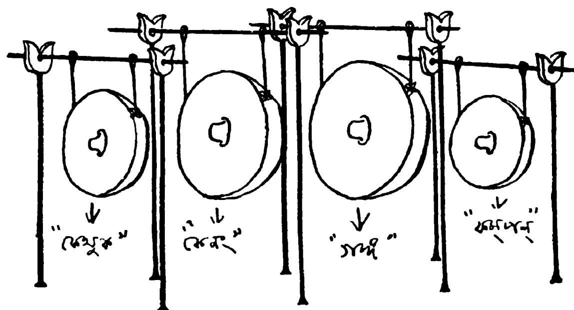
জাভার ঢোল ক্যানাডাং। চামড়ার তৈরি। বাজাবার পদ্ধতি আমাদের দেশের মতই।



জাভা ও বলির বাঁশের তৈরি বাজনা আংক্লুং। এক-একটি বাঁশ এক-একটি সুরের সঙ্গে মিলিয়ে কাটা।



জাভার একতারের যন্ত্র রবাব। ঘোড়ার ল্যাজে তৈরি ছড়ের টানে বাজে। কেবল কণ্ঠসংগীতের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।



নানা আকারের ও বিভিন্ন পরদার সুরে তৈরি কতকগুলি ঘণ্টা

বড় ঢোলের দু ধারে পর পর শব্দ করে বাজায়। বাকি কয়টি বাজে ছোট যন্ত্রটিতে। আর-একটি আলাদা ঢোল থাকে নৃত্যনাট্যে কখনো কখনো দ্রুত লয়ের কোনো অভিনয়ে সে ঢোলটি ব্যবহৃত হয়। তখন একই ঢোলে দ্রুতলয়ের তাল বাজাতে দেখা গেছে।

পুরু কাঁসার বড় করতালকে ওরা নাম দিয়েছে চংচং। বলিতে এটি অতি প্রয়োজনীয় বাজনা। কাঠের গোল একটি ফ্রেমের উপর খুব শক্ত করে আটকানো একখানি থাকে মাটিতে চিৎ করে শোয়ানো, অপর করতালটি নিয়ে এক হাতে এইটির উপরে আঘাত করে। ঠিক ঐরকম আর-এক জোড়া থাকে অপর হাতে। প্রায়ই দেখা যায়, বড় বড় দলে চারজন বাজিয়ে প্রায় আট জোড়া করতাল নিয়ে বসে। করতালের কাজ হল অবিকল ঢোলের ছন্দ অনুসরণ করা, ঢোল যেভাবে ছন্দ তুলবে করতালেও সেটি বাজবে। ঢোলের শব্দ জোর হলে করতালও সজোরে বেজে ওঠে, যখন মৃদু শব্দে বাজে তখন করতালের শব্দ হবে মৃদু। জাভার নৃত্যাভিনয়ে বা অন্য কোনো নৃত্যে এই করতাল ব্যবহারের প্রচলন নেই। কোনো কোনো লোক-নৃত্যে ছোট করতাল বাজাতে দেখা যায়।

গাংসা-জংকং যন্ত্রটি অবিকল জাভার গেন্ডার যন্ত্রটির মত। তবে এর কাঁসার পাতগুলি অনেক পুরু। জাভার মত দুই হাত ব্যবহার করতে হয় না। কেবল ডান হাতে কাঠের ছোট হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে ও বাঁ হাতে সঙ্গে সঙ্গে সুর চেপে দেয়। দুই সপ্তক পর্যন্ত সুরের পাত এই যন্ত্রে থাকে।

গাংসাগানটুং যন্ত্রটি উপরের যন্ত্রটির মত, কিন্তু কেবল উদারা এক-সপ্তক সুর এতে আছে। এর কাজ হল সুরের রেশ রাখা এবং গতের প্রতি চার মাত্রা বা আট মাত্রা পরে সুরের সঙ্গে মিলিয়ে বাজা। এর হাতলটিতে খুব মোটা ও গোল করে কাপড় জড়ানো থাকে।

ছোট ছোট তেরোটি ঘণ্টাযুক্ত যন্ত্রকে এরা বলে রেয়ং। একটি লম্বা কাঠের ফ্রেমে দড়ির উপর উপুড় করে বসানো থাকে এক সারিতে।

পাশাপাশি চারজন লোক একসঙ্গে বসে বাজায় কাঠের হাতল দিয়ে। ঢোলের ছন্দ তোলাই হল এর কাজ।

ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের ঝালা বাজনার কথা সকলেই জানেন। যন্ত্রীরা যার সাংকেতিক নাম দিয়েছেন ডারারারা। সেতারে ডা তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে প্রথম তারে আঘাত করে, বাকি রারারা শব্দ কয়টি চিকারির তারে বাজায়। বীণাতে রারারা শব্দ চিকারিতে কনিষ্ঠ আঙুলের আঘাতে হয়। এই প্রথায় অনেকে বহু বিচিত্র ছন্দ তোলে। রেয়ং-যন্ত্রীরা বলির যন্ত্রসংগীতে প্রায় সেই কাজই করে। ঢোলের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে এক-একজন তিনটি ঘণ্টা নিয়ে বাজায়।

জাভায় এই যন্ত্রটি থাকে দুই সারিতে। একজন বাজায়। জাভায় বহু যন্ত্র একসাথে বাজাবার প্রথার পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি, কিন্তু বলি সেই প্রথা গ্রহণ করে নি, তারা গেছে একটু ভিন্ন পথে।

আমাদের দেশে সেতার ও স্বরদ ইত্যাদিতে ডা রা আঘাত তোলে একটি যন্ত্রে একজন। এরা এদের যন্ত্রে তা করবে না। এরা দু দলে ভাগ করে এই শব্দ বাজাবে। ধরা যাক, দুই সেতারী ভাগ করে নিয়েছে যে একজন গতের কেবল ডা আঘাত করবে, অপর জন করবে রা। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন এ আবার কি করে সম্ভব হয়। কিন্তু বলিতে তা করতে দেখেছি, তারা দু দলে ভাগ হয়ে এক দল বাজাবে যে স্বর অন্য-দল বাজাবে ঠিক পরেরটি। এবং বিনা দ্বিধায় ও বেশ দ্রুত, নানাপ্রকার কঠিন ছন্দে তারা বাজিয়ে থাকে। জাভা এ পদ্ধতি গ্রহণ করে নি। বলির গাংসাজংকং যন্ত্র একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে, এগুলি দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। ঢোলও সর্বদা দুটি থাকে। দুজন বাজিয়ের কাছে দুজোড়া করতাল এক-একজনের কাছে থাকে ঐ পদ্ধতিতে বাজানোর জন্যে। এদের গামেলান-সংগীত এত দ্রুত বাজানো সম্ভব হয়েছে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে বলে।

দুই দেশেই পূর্বে কখনো সংগীত লিখে রাখার প্রথা ছিল না, শুনে শুনেই তারা শিখেছে ও মনে রেখেছে। এখনো বলিতে কোনো লিখন-

পদ্ধতির আবির্ভাব হয় নি, জাভাতে তা হয়েছে, তারা স্বরকে এক দুই ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করে। সেই নিয়মেই কিছুকাল থেকে জাভা তাদের স্বরলিপি লেখা শুরু করেছে। তবে সে প্রথায় নানা দেশের বিচিত্র পদ্ধতির সংগীত লিখে রাখা সম্ভব নয়। বলির স্বর কটির নাম ডিং ডং ডেং ডুং ডাং।

বলির স্থলিং ও রবাব ঠিক জাভার মত বাঁশের বাঁশি ও একতারের যন্ত্র। কেবল কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে বাজে, গামেলান-সংগীতের সঙ্গে কখনো বাজে না। জাভায় গামেলান-সংগীতের সঙ্গে গান হয়, রবাব ও স্থলিং সেই সঙ্গে বাজে। বলিতে গান কখনো গামেলান-সংগীতের সঙ্গে করে না বলে রবাব ও বাঁশিও তার সঙ্গে বাজে না।

আংক্লুং নামে জাভায় ও বলিতে ফাঁপা বাঁশের তৈরি যন্ত্রটি ভারি চমৎকার। উভয় দেশে এখনও এর চলন আছে। তবে ভালো ভালো নাচে বা নৃত্যাভিনয়ে এর ব্যবহার নেই। কেবল লোকনৃত্যের জন্যেই তৈরি। যন্ত্রটি নানা আকারে ফাঁপা শুকনো বাঁশের সমষ্টি। বেশি লম্বা নয়, এক হাত থেকে দেড় দুই হাত পর্যন্ত দেখা যায়। এক-সঙ্গে একটি কাঠের ফ্রেমে সরু দড়িতে ঝোলানো থাকে। এক-একটি বাঁশ এক-একটি স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে কাটা। একসঙ্গে বাজনার তালে তালে হাতের ঝাঁকানিতে একটা অদ্ভুত স্বর বেরতে থাকে। শব্দও খুব জোর।

বলিতে গামেলান-সংগীত যেভাবে সে দেশের জনসাধারণের মনে বসে গেছে জাভায় তা হয় নি। বলির প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বাজিয়ে। তারা সারা দিনের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যা হলেই প্রতি গ্রামে বসে যাবে দল বেঁধে বাজনা বাজাতে। উৎসবে অনুষ্ঠানে সামাজিক যে-কোনো ব্যাপারে এই সংগীত না হলেই নয়।

এখানে একটা কথা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন যে, আজ আমাদের কি ভারতীয় কি বিদেশি, সকলেরই ধারণা সমগ্র জাভাই বুঝি খুব শিল্প-ভাবাপন্ন জাত। কিন্তু তা ভুল। জাভা আয়তনে খুব বড়। লম্বায় প্রায় পঁচিশ মাইলের উপরে, চওড়ায় দেড় শ থেকে দু শ পর্যন্ত হবে। এই

দেশের মাত্র দুটি ছোট জেলায় তাদের প্রাচীন সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন আজও বেঁচে আছে। তাও আবার এসে ঠেকেছিল কতগুলি পরিবারের হাতে, যারা এই দুই জেলার সুলতানদের আগ্রহে এখনো এসব নিয়ে কারবার করে। প্রাচীন ধারার যা-কিছু নমুনা এ দুইটি জায়গা ছাড়া জাভার আর কোথাও ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব সে দেশেও অতি প্রবল, গান-বাজনা সবই তৈরি হচ্ছে বিদেশীয় যন্ত্রে, বিদেশীয় সুরে, কেবল ভাষাটি নিজের। পথে ঘাটে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী-জনসাধারণের মধ্যে বেশ-ভূষায় গান-বাজনায় ও নাচে বিদেশি প্রভাব খুব।

বলিতে এতটা হয় নি। সেখানে সর্বত্রই দেখেছি তাদের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি একটি গভীর মমতাবোধ। তার উপর দাঁড়িয়েই তাদের শিল্পবোধ নানা নতুন পথে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।

পূর্বেই বলেছি, জাভার সংগীত খুব ধীর স্থির ও গম্ভীর, অসীম সমুদ্রের গভীরতার আভাস তাতে আছে। এদিকে বলি আপন প্রাণের আবেগে চঞ্চল, ঠিক যেন বর্ষার পাহাড়ে-নদী, কত রকম তার গতি, কত রকম তার ছন্দ, কত প্রকারের ধ্বনি। সেই জন্যে বলির যন্ত্র-সংগীত শুনে ইয়োরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরাও মুগ্ধ হয়। আমাদেরও মন আকর্ষণ করে। বিলেতি যন্ত্র-সংগীতের মত মেলডি-বর্জিত হারমনি-সংগীত নয় বলে। জাভার সংগীতের রস গ্রহণ করতে হলে সংগীতে বেশ একটু গভীর রসবোধ থাকা দরকার। তা না হলে বেশির ভাগ বিদেশি শ্রোতাদের মতনই শুনতে হয়তো ক্লান্তি আসতে পারে।

এই দুই দেশের সংগীত আলোচনা-কালে আমার মনে হয়েছিল যে, ভারতবর্ষে আমরাও আজকাল যন্ত্রে ঐকতান সংগীত রচনার চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু তা এখনো বিরাট সংগীতে পরিণতি লাভ করতে পারে নি। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারতীয় যন্ত্রসংগীত বাজত একসঙ্গে এক নিয়মে। আজকাল যদিও বৈচিত্র্য দেবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তার ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশ্চাত্যের প্রভাব। সে প্রভাব ভালো কি মন্দ তার আলোচনা এখানে তুলব না, কিন্তু একথা বলব, সব ক্ষেত্রেই তার

অনুকরণে আমরা আমাদের সংগীতের আদর্শ যে নষ্ট করব এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বিলিতি যন্ত্রসংগীতের বহুস্বরের সামঞ্জস্যে যে একটি বৃহৎ অখণ্ড সংগীতের প্রকাশ পায় তা সত্যি উপভোগ্য। কিন্তু তারা যে জিনিসটিকে আজ সম্পূর্ণরূপে হারাতে বসেছে সেই মেলডিকে আমরা তো হারাতে পারি না, কারণ মেলডির পূর্ণবিকাশই আমাদের সংগীতের বৈশিষ্ট্য। আমাদের হারমনি-বর্জিত রাগিণীর রস উপভোগ করা তাদের কাছে আজ একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, এই মেলডিকেও হারাব না অথচ আমাদের সংগীত কি করে বিরাট একটি অখণ্ড সংগীতে পরিণত হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমার বারবারই মনে হয়েছে যে, যদি জাভা ও বলির গামেলান-সংগীতের পদ্ধতিকে আমরা গ্রহণ করি তবে আমাদের সে ভাবনা থাকে না। আমাদের সংগীত আরো বড় হয়ে উঠবে, কারণ আমাদের সংগীতে আছে নানা রকমের রাগরাগিণী আর নানা প্রকারের তাল, যা জাভা বা বলিতে নেই।

## নারীনৃত্য। শ্রিম্পী

জাভার বিভিন্ন জাতীয় নাচের মধ্যে শ্রিম্পী নামে নাচটি সে দেশের শ্রেষ্ঠ নাচ ব'লে মনে হয়েছিল। এ নাচটি মধ্যজাভার সামন্তরাজাদের অন্দরমহলের নাচ। মেয়েদের নাচ হিসেবেই বিখ্যাত। প্রাসাদের বিশেষ উৎসবে বা বিশেষ অতিথি-সমাগমে এই নাচ অনুষ্ঠিত হত। অংশ গ্রহণ করতেন সাধারণত রাজকুমারীরা ও অন্তঃপুরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত কুমারীরা। সুতরাং এ নাচ দেখবার সৌভাগ্য বিদেশি কেন, সে দেশবাসীর পক্ষেও সহজ ছিল না।

জাভার এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্মে মুসলমান হলেও সামাজিক আচার-ব্যবহারে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের কতগুলো সংস্কারকে ত্যাগ করে নি। বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের অনেক শুভকর্মে বা

উৎসবে এমন-সব আচার-অনুষ্ঠান দেখা যায় যা অন্য কোনো দেশের মুসলমান সমাজে নেই। গীতবাদ্যনৃত্যের বেলায়ও সেই কথা খাটে। মুসলমান-পূর্ব যুগে নাচ ছিল ধর্মের অঙ্গ বিশেষ। পরে সে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু নিজেদের জীবনের নির্মল আনন্দের খোরাক হিসেবে এরা নাচ-গানকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে বলে একে ত্যাগ করে নি। তাই এই প্রাচীন নাচ এখনো সে দেশে বেঁচে আছে।

জাভার নাচের একটি বড় কথা হল, নাচের সময় মনের সব রকম চাঞ্চল্য দূর করে মনকে সেই নাচের রসেই ডুবিয়ে রাখা। তাই তাদের নাচের সময় মুখ দেখে মনে হবে যেন এরা নিজের জন্যেই নাচছে। তাদের সামনে যে দর্শক আছে বা কেউ তাদের দেখছে, তাদের মুখের ভাব ও চোখের দৃষ্টিতে তার কোনো পরিচয় ফোটে না। তারা সমস্ত দর্শককে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেন আসরে অবতীর্ণ হয়। পাছে নাচতে নাচতে চোখের দৃষ্টি দর্শকবৃন্দের উপর পড়ে এই আশঙ্কায় প্রাচীনেরা নিয়ম করে দিয়েছে যে নাচের সময় নাচিয়ের দৃষ্টি সর্বদা মাটিতে নিবদ্ধ থাকবে। এ নিয়ম বহুদিনের। সে দেশের এই নারী-নৃত্যের শিক্ষকরা সকলেই দেখলাম পুরুষ। এবং তারাই এই নাচের ভালো-মন্দ দোষ-গুণ ভুল-নির্ভুলের একমাত্র বিচারক। বিদেশাগত দর্শকরা, যাঁরা এ নাচ দেখেছেন, তাঁরা অনেকেই এর একঘেয়েমী ও ধীর গতিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তার কারণ তাঁরা নাচ বলতে যা বোঝেন এ নাচ সেদিক দিয়েই যায় নি। তাই শ্রিম্পী নাচের এই শান্ত ধীর আবহাওয়াটিকে তাঁরা অনেকেই বেশিক্ষণ বরদাস্ত করতে পারেন না।

সে দেশে এ নাচের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গল্প খুব প্রচলিত। এই গল্পটি থেকেও বোঝা যায়, এ নাচের মূলে আছে প্রাচীন ভারতের প্রভাব। জাভার ঐতিহাসিকরা বলেন, এ নাচ এক সময় সে দেশের মন্দিরের দেবদাসীদের নাচ হিসেবেই প্রসিদ্ধ ছিল। এই দেবদাসীদের বলা হত ইস্প্রী। মুসলমান-যুগে যখন হিন্দুমন্দিরের কাজ শেষ হল,

তখন দেবদাসীরা স্থান পেল সে দেশের সুলতানদের অন্তঃপুরে। তখন থেকে তাদের যত্নেই নাচটি রাজ-অন্তঃপুরের সামগ্রী হয়ে আছে। এখনো পর্যন্ত এ নাচ কুমারী মেয়েদের মধ্যেই আবদ্ধ, বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে এ নাচের প্রচলন নেই।

প্রাচীন গল্পে আছে: ব্রহ্মার শখ হল, তিনি একদিন অতি সুন্দরী কয়েকটি নারী রচনা করে তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন। সেই সুন্দরী স্বর্গকন্যারা প্রাণলাভের পর এমন সুন্দর নৃত্যে চারদিক মধুময় করে তুলেছিল যে তাদের তিনি যতই দেখেন ততই তাদের রূপে ও নৃত্যে বিভোর হয়ে ওঠেন। একটি মুখের দৃষ্টিতে তিনি কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন এই হল তাঁর সমস্যা। অথচ প্রত্যেক সুন্দরীকে না দেখেও তৃপ্তি পাচ্ছেন না, এ রকম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি খেলল, তিনি মনে-মনে ভাবলেন চারদিকে এভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অন্যান্য দেবদেবীদের কাছে তাঁর সম্মান থাকে না, অথচ সবদিকে একই সঙ্গে তাকানো যায় এরই উপায় স্বরূপ যদি চারটি মাথা ঘাড়ের উপরে থাকে তবে তো কেউ কিছু সন্দেহ বা নিন্দা করতে পারবে না। সুতরাং যে মুহূর্তে এই চিন্তা মাথায় এল অমনি তিনি চারটি মাথা জুড়ে নির্বিঘ্নে সেইসব সুন্দরীদের সৌন্দর্য ও নৃত্য দর্শন করলেন। তার পরে সেই সুন্দরীরা পৃথিবীতে তখনকার এক নৃপতির রাজ্যে এসে এ নাচকে পৃথিবীতে স্থাপন করলেন, রাজা তাকে অতি যত্নের সঙ্গে নিজের প্রাসাদে রক্ষা করতে লাগলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রাজবাড়িতেই সে আছে।

মূলত একই ভঙ্গি ও ছন্দ থেকে উৎপন্ন হয়ে এই নাচ ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন নাম গ্রহণ করেছে। যখন একটি মেয়ে নাচবে, তখন তার নাম হল শারীতুঙ্গল। শ্রিম্পী নাচে থাকে দু জন বা চার জন, দু জনে যখন নাচছে তখন বলবে রারাষশ্রী। নয় জন মেয়ে একসঙ্গে যখন নাচবে তখন বলবে বটেজো। দেহভঙ্গি, পা-ফেলার কায়দা, চলা, ওঠা, বসা, সবই এক। কেবল নাচের পিছনে যে গল্প থাকে, তার

পার্থক্য আছে। আর আছে নাচের সময় গ্রুপিঙের (grouping) তফাত।

শারীতুঙ্গল নাচে আমরা পাব যাবতীয় প্রাচীন নারীনৃত্যের একটি সুন্দর সমাবেশ। এর পিছনে কোনো গল্প নেই। গামেলান বাজনাই এর সম্বল। এই নাচে যে পটু হয় তার পক্ষে অন্য-কোনো নারীনৃত্য কঠিন লাগে না। শ্রিম্পী নাচের গল্প আছে: শ্রীখণ্ডি নামে একটি রাজকুমারী অর্জুনের কাছে যুদ্ধবিদ্যার চর্চা করতেন। অর্জুন তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। রাজকুমারী বললেন, অর্জুন-পত্নী লারাসতীকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি নিজেকে অর্জুনের যোগ্য পরিচয় দেবার পর তাদের বিয়ে হতে পারে। শুরু হল উভয় নারীর মধ্যে যুদ্ধ। লারাসতী পরাজিত হলেন, অর্জুনের সঙ্গে শ্রীখণ্ডির বিবাহের আর কোনো বাধা থাকল না।

আর-একটি গল্পে আছে: দুইটি রাজকুমারী বেরিয়েছেন তাঁদের মনের মত রাজপুত্রের সন্ধানে, বিয়ে করবার ইচ্ছায়। নানা দেশ ঘুরে এক দেশের এক রাজকুমারকে উভয়েই পছন্দ করলেন। কিন্তু কে তাকে বিয়ে করবে তা নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠল তখন ঠিক হল পরস্পরে যুদ্ধ ক'রে এর মীমাংসা করবেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হল, একজন পরাজিত হলেন এবং ভগ্নমনোরথ হয়ে রাজকুমারকে বিবাহের আশা ত্যাগ করতে হল।

বটেজো নাচের মেয়েদের সংখ্যা প্রায়ই দেখা যায় সাত কিম্বা নয়। প্রশ্ন করে জেনেছি, এই সাত কিম্বা নয় সংখ্যা দুই ভাগে ভাগ করতে গেলে এক দিকে একজন বেশি না রেখে উপায় থাকে না। তখন এক দল অপর দল অপেক্ষা সংখ্যায় দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এই এক দিকে কম ও অপর দিকে একজন বেশি রেখে এই কথাই বোঝানো হয় যে, দুর্বলের সঙ্গে সবলের লড়াই হল এ নাচের ভাবার্থ। এবং সংখ্যায় কম যেদিক, সেদিক জয়লাভ করবে। এই নাচের গল্পটি হল: প্রবল পরাক্রান্ত পান-বাহন সেনাপতি সব সময় অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধলিপ্ত থাকতেন ও

সকলেই তাঁকে ভয় করত। কিন্তু ম্যাডুন-এর রাজা পাঙ্গারানতিমোর পানবাহন সেনাপতির কাছে পরাজিত হয়েও বশ্যতাস্বীকারে অসম্মত হন। এই রাজার রত্নাতুমিলা নামে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। যুদ্ধের সময় রাজকন্যা একলাই প্রাসাদে ছিলেন ব'লে পিতা কেয়াইগুমারাং নামে একটি দৈবশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র রেখে গিয়েছিলেন আত্মরক্ষার জন্য। দরকার হলে পানবাহন সেনাপতিকে এর দ্বারা হত্যা করা সম্ভব হতে পারে এই ভেবে। পানবাহন সেনাপতি প্রাসাদে প্রবেশ করলে পর রাজকন্যা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্রখানি নিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। পানবাহন দেখলেন বিপদ, তখন বুদ্ধি করে রাজকন্যাকে নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে শুরু করলেন। রাজকুমারীর ক্রোধ প্রশমিত হল, ধীরে ধীরে তিনি পানবাহনের অনুরক্ত হয়ে পড়লেন এবং পানবাহন তার কাছে প্রেমনিবেদন ক'রে রাজকুমারীকে লাভ করলেন। উপরোক্ত অস্ত্রটিও তাঁর হস্তগত হল।

উপরোক্ত গল্প থেকে আমরা দেখতে পাব প্রত্যেক নাচে যুদ্ধের কথাই বিশেষ করে বলা হয়েছে। এবং এদের এই নাচকে সম্পূর্ণ যুদ্ধ-নৃত্য বলা চলে।

হুবহু নৃত্যনাট্যের যুদ্ধের নিয়মে তীর ধনুক ঢাল ছোরা হাতে নিয়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধ করে। আসরে অস্ত্রহাতে প্রবেশ করে না, নৃত্যনাট্যের মত সুসজ্জিত পরিচারিকারা নাচের সময় অস্ত্র হাতে এগিয়ে দেয় ও শেষ হলে নিয়ে যায়।

গ্যালক নামে একক নৃত্যটি শ্রিম্পী নাচের অনুকরণে গঠিত। কিন্তু অল্পবয়সের বালক বা পেশাদারী নর্তকী ছাড়া ভদ্রঘরের কোনো মেয়েদের এ নাচ নাচতে দেখা যায় না। কিন্তু এর সাজ অবিকল শ্রিম্পী নাচেরই মত। ছেলেরা যখন মেয়ে সেজে নাচে তখন না ব'লে দিলে বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে যে, যে নাচছে সে মেয়ে না ছেলে। রাজাপ্রসাদে এ নাচের চলন দেখেছি। প্রত্যেক নাচই শেষ করতে পঞ্চাশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগে। সমস্তক্ষণ আধখানি হাঁটু মুড়ে, শরীর হাত

ও মাথা নানা ভঙ্গিতে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে ধীরে ধীরে চলার যে নাচ তা থেকে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, শরীরের শক্তি ও মনের অসীম ধৈর্য ছাড়া এ নাচ কোনো মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ বাইরে থেকে মেয়েদের শারীরিক কমনীয়তা দেখে মনে হবে না যে, এ নাচের ভিতরে শক্তিরও প্রয়োজন আছে। এই নাচের বিভিন্ন ভঙ্গিতে যে প্রভেদ বাইরের অশিক্ষিত চোখে তা ধরা খুবই কঠিন, কিন্তু প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি বিভিন্ন ভঙ্গি ও চলাতে নাচগুলি বিভক্ত। প্রত্যেকটি ভঙ্গি নিখুঁত। নাচের সময় দেহের প্রায় প্রতি অঙ্গই শক্ত হয়ে থাকে, কোথাও শৈথিল্য প্রকাশের উপায় নেই। ভঙ্গিগুলিও খুব স্পষ্ট। ধীরগতিতে ঢেউয়ের মত একটার পর একটা চলেছে। আগেরটির সঙ্গে পরেরটির যোগে একটা সমতা বা সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়। এইভাবে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যেন দেহ-ভঙ্গির ঢেউ খেলে যায়।

পূর্বে বলেছিলাম, এ নাচকে যুদ্ধনৃত্য বলা চলে। এ যেন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। ধনুক ও তীরকে খেলার তীরধনুক বলা চলে। ধনুক থেকে তীর কখনো বাইরে ছুটে যায় না। ধনুকের সঙ্গে লেগে থাকে। ছোরার দ্বারা আক্রমণে আছে কেবল আক্রমণের একটি সুন্দর নৃত্যভঙ্গি। মোট কথা, বাস্তবতাকে নৃত্যে হাস্যকর উপায়ে প্রকাশ করবার কোনো চেষ্টা তাদের এইসব যুদ্ধ-নৃত্যে একেবারেই নেই। বাস্তবজগৎ থেকে নাচের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে নাচের ভঙ্গিতে প্রকাশ করার একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখেছি এই জাভানৃত্যে। এদিক থেকে তাদের নাচে আর-এক বিশেষ শিক্ষণীয় দিক আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। পিছনে গায়কদের গানের সাহায্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা ফুটে উঠছে সেটিকে মনে গ্রহণ ক'রে তার ভিতর দিয়ে এসব নাচকে দেখতে পারলেই এদের নাচের প্রকৃত রসটি ধরা পড়ে।

যোগজা ও সোলো এই দুই শহরের একই নাচের পদ্ধতিতে সাজে-বাজনায় অনেক পার্থক্য দেখেছি। সোলোর রাজপ্রাসাদ গর্ব করে বলে, তাদের নাচে নারীসুলভ কোমলতা বেশি, যোগজা বেশ কড়া।

যোগজা তার উত্তরে বলবে, শক্তির প্রকাশই তাদের নাচের বৈশিষ্ট্য। সোলোর নাচে নাচিয়েদের নাচের ভঙ্গিতে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয় যা যোগজা দেয় না। যোগজা এর জন্যে একটুও লজ্জা বা দুঃখ বোধ করে না। যোগজা বলছে তারা স্বাধীনতা প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এমন খিচুড়ি সৃষ্টি করেছে যে তা রসোত্তীর্ণ হয় নি। তবে নাচের ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যোগজার নাচ মন আকর্ষণ করেছে বেশি। কারণ মিশ্রণের মধ্যেও চাই শিল্পীর দৃষ্টি, সে দৃষ্টি সোলোর নাচে প্রকাশ পায় নি। যোগজার নাচ সোলো অপেক্ষা অনেক সুনির্দিষ্ট। যোগজার মেয়েরা আজকাল সবুজ রঙের ভেলভেটের হাতকাটা জ্যাকেট ব্যবহার করে, তাতে সোনালি রুপালি জরির কাজ থাকে। সোলোর মেয়েরা জ্যাকেট পরে না। তারা বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সেই রকম ভেলভেটের কাপড় জড়ায়। এর নাম মেকক। কাঁধ থাকে খোলা। পরনের বাতিকের কাপড়কে বলে কাইন। মাথার মুকুট, হাতের ও গলার যাবতীয় গয়না মহিষের চামড়ার। সোনালি রং করা থাকে বলে রাত্রে সুন্দর দেখায়। তাতে নানাপ্রকার নকশা কাটা থাকে। নাচের সাজে অনাবশ্যক জাঁকজমক নেই। নৃত্যোপযোগী দেহের গঠনের সঙ্গে জামাকাপড়-চাদর এক হয়ে গেছে। সেইজন্যেই নাচের সময় মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ভঙ্গি ছবির মত সকলের চোখে ভেসে ওঠে। তাছাড়া এদের নাচের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে অপর-সব অঙ্গের সুন্দর সংগতি। অর্থাৎ আনাড়ির মত একদিকে বেঁকে দাঁড়ালে দেহের অন্য অঙ্গকে কিভাবে সাজাতে হয় সে কথা না জানা থাকলে সে দেশে তাকে নাচিয়েই বলবে না। জাভায় মেয়েরা নাচের সময় পায়ে কোনো প্রকার ঘুঙুর ব্যবহার করে না। কারণ পায়ের তালের কাজ বলতে আমরা যা বুঝি, এরা নাচটাকে সেদিক থেকে বড় করে দেখে না। গানের বা তালের ছন্দ, এদের দেহের দোলায় বা ওঠানামার ঝোঁকে প্রকাশ পায়। নাচের সময় পা কখনো মাটি থেকে এক আঙুল উপরে উঠতে দেখি নি, পা যেন মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে।

জাভা-নাচের বিশেষ দ্রষ্টব্য হল চাদরের খেলা। কোমর থেকে সামনে তুই পায়ের মাঝখান দিয়ে প্রায় মাটি পর্যন্ত চাদরটির তুই প্রান্ত ঝুলতে থাকে। সাধারণত লাল রঙের চিত্রিত চাদরই তারা ব্যবহার করে; নাচের সময় তুই হাতে নানা ভঙ্গিতে কখন তুলছে, কখনো ফেলে দিচ্ছে, কখনো নানাদিকে ছুড়ে দিচ্ছে, এই রকমের বহু বিচিত্র রকম তার খেলা। নাচের সময় চাদর যে কতখানি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে জাভার নাচে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। এই চাদরের ব্যবহার না থাকলে জাভা-নৃত্যের অর্ধেক সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যেত বলে মনে হয়। চাদরের ব্যবহারও খুব সুনির্দিষ্ট। প্রত্যেক রকমের ব্যবহারের আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন, ন্যাথোক অর্থাৎ চাদর ঘুরিয়ে উপরের দিকে তুলে নিয়ে হাতের পাতা ঢাকা দেওয়া; কিপ্যাট, নীচের দিকে ফেলে দেওয়া; সেক্লাক, পিছনে ছুড়ে দেওয়া। এই রকমের অনেক নাম। কেবল চাদরের বেলাতেই যে এ ধরনের নামের তারা পক্ষপাতী তা নয়। হাঁটা, হাত ঘোরানো, মুখের ভঙ্গি, প্রত্যেকটারই নাম আছে। কিচাট, গরম বালির উপর হাঁটার মত পা তুলে তুলে হাঁটার ভঙ্গি। ন্যাম্‌বের, নাচিয়েদের পরনের কাইনের যে অঞ্চলটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সেটিকে পায়ে করে ছুড়ে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। অম্বাটোজা, জলের ঢেউ, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ দোলানো; গেডরক, পা পিছনে নিয়ে আঙুলের উপর ঠোকা; পাচাকলু, কণ্ঠের একটা ভঙ্গি। চাদরের এইরূপ ব্যবহার জাভার নৃত্যনাট্যেও বিশেষ স্থান গ্রহণ করে আছে। প্রাচীন নাচের এটা হল একটা বিশেষত্ব।

এই নাচ বহু যুগ ধরে রাজ-অন্তঃপুরেই লালিত ও পালিত হয়ে এসেছে, কিন্তু ইদানীং যোগজার রাজকুমারদের উৎসাহে সে দেশের সাধারণ বিদ্যালয়ে এই নাচ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যে এ নাচকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা বেশ কিছুকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এ কাজে সে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তামানশিস্যই

হল পথপ্রদর্শক। আরম্ভে এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত দেবাস্তর যোগজার রাজকুমারদের সাহায্যে তামানশিস্থর মূলকেন্দ্রে প্রতি বৎসর বহু ছাত্র-ছাত্রীকে জাভার যাবতীয় নাচ গান ও বাজনা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। তারাই উপযুক্ত হয়ে এখন উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কেন্দ্রে নৃত্যগীত শেখাচ্ছে। এই ভাবে সেখানকার প্রাচীন সংগীত ও নৃত্য অতি দ্রুত জাভার সমস্ত পূর্বাঞ্চলে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

## লেগং নৃত্য

মানুষের জীবনে শিল্পের স্থান কতখানি সহজ হতে পারে তা বলিতে এসে এখানকার মানুষের পরিচয় লাভ করে বুঝতে পেরেছি। শিল্পে সকলেরই এখানে সমান অধিকার। এরা যদিও জাভার অধিবাসীদের তুলনায় অনেক দরিদ্র, তবু নানা প্রকার শিল্প ও নৃত্যগীত এখানে সকলের বিশেষ আনন্দের বস্তু; এর জন্যে রাজার সাহায্য, বিদেশি শাসনকর্তার সাহায্য, কিছুই দরকার করে না— প্রত্যেক গ্রামে মনের আনন্দে আপনা থেকেই এসব গড়ে উঠেছে। জাভাতে নৃত্যগীত ছিল দরবার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত। রাজদরবারের অনুগ্রহ লাভ করলে তবে জনসাধারণ আনন্দ উপভোগের সুযোগ পেত। বলিতে ঠিক তার উলটো। এখানে দরবারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় পরিচালিত কোনো নাচের দল দেখা যায় না, কারণ প্রত্যেক গ্রামেই নাচের ও বাজনার দল থাকবেই। সেই নাচ ও বাজনা হল বলির অধিবাসীদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার একান্ত আবশ্যকীয় অঙ্গ। আনন্দ-উৎসবে, পূজাপার্বণে, জন্মমৃত্যুবিবাহ প্রত্যেক উপলক্ষ্যে নাচ ও বাজনা না হলে কোনো অনুষ্ঠানই এদের সম্পূর্ণ হয় না। গ্রামে কোনো বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব হলে এরা গ্রামের দেবতার কাছে সকলে মিলে পুজো দেয়, নাচ সেই পুজোর প্রধান অর্ঘ্য।

একদিন দেনপাশার শহরে সন্ধ্যাবেলায় খবর পেলাম, পাশের গ্রামে রাত নটার সময় দুটি কিশোরীর নাচ হবে। নাচের নাম শ্যাংয়াং।

নাচের উপলক্ষ্য গ্রামে অসুখ দেখা দিয়েছে, গ্রামের অধিবাসীরা রোগ-নিবারণের উপায়স্বরূপ এ নাচের ব্যবস্থা করেছে। বলিদ্বীপবাসী বন্ধুর সঙ্গে তখনি বেরিয়ে পড়লাম, মাইল-দুয়েক পথ। দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম, গামেলান-সংগীতের টুংটাং শব্দ, এ দেশের ঢোলকের দ্রুত লয়ের বাজনা ও করতালের ঝক্‌মক্‌ শব্দ। সেখানে গিয়ে দেখি, একটি ছোট দেবালয়ের প্রাঙ্গণে জন-পঁচিশ স্ত্রী-পুরুষ স্তিমিত আলোকে চার দিকে ঘিরে বসে আছে। যে ঘরটিতে পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল সে-ঘরে পূজারী বসে, সেই ঘরটির দিকে মুখ করে সুন্দর সাজে সজ্জিত দুটি গ্রামের মেয়ে তন্ময় হয়ে নাচছে। আলোর ক্ষীণ আভায় মেয়ে দুটির মুখের দিকে প্রথমে আমার দৃষ্টি পড়ে নি। একটু পরেই আবছা আলোয় দেখি মেয়ে দুটির চোখ মুদ্রিত। আমি অবাক হলাম, কারণ চোখ বুজে এত দ্রুত লয়ে, বাজনার তালে এমন ছন্দ ঠিক রেখে, নানাপ্রকার দুরূহ ভঙ্গিতে যে কেউ নাচতে পারে তা একেবারেই ভাবতে পারি নি।

কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এরা পূজারী কর্তৃক মন্ত্রপূত; যতক্ষণ মন্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকে, ততক্ষণ বাইরের জগতের বিষয়ে এদের কোনো জ্ঞান থাকে না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, এদের দেহের ভিতর দিয়ে মন্দিরের দেবীই নৃত্য করেন। পূজার সফলতা নৃত্যের উপরে নির্ভর করে। মেয়ে দুটি যতক্ষণ নাচল, মুহূর্তের জন্যেও দেখলাম না তাদের কোনো রকম অসুবিধা বোধ করতে; কোনো রকম পদস্খলন, এক জনের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ, বা নাচতে নাচতে নিজেদের গণ্ডির বাইরে চলে যাওয়া, কিছুই হয় নি, নিখুঁতভাবে তারা নেচে গেল।

এর পরে আর-একটি নাচ দেখি, এ দেশের বিখ্যাত কুনিংগান্‌ উৎসব উপলক্ষ্যে, পূর্ব-বলির এক শহরে। এ নাচটির নাম রজ্জাং। বলির এই অঞ্চলে এ নাচের বিশেষ খ্যাতি। নাচের কারুকার্যের দিক থেকে এ নাচ খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু উপলক্ষ্যটা ছিল অতি সুন্দর।

শহরটির ছোট মন্দিরে সেদিন অপরাহ্ণে ছিল পূজার আয়োজন। মন্দিরটি রাজবাটীর সংলগ্ন। সাড়ে পাঁচটায় পুজো আরম্ভ হবে, কিছু

আগেই সেখানে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি মন্দিরের মাঝখানে প্রধান দেবতার বেদীতে মন্দিরের রক্ষক ও একটি যুবতী নানাপ্রকার অর্ঘ্য সাজাতে ব্যস্ত। একদিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনেক মহিলা জড়ো হয়েছেন। সেইসঙ্গে একদল ছোট ছোট মেয়ে, ফুলের মুকুট মাথায়, অতি গম্ভীর মুখে, রঙিন কাপড়ে সেজে এক দিকে বসে আছে। শুনলাম, এরাই হচ্ছে এ বৎসর দেব-মন্দিরের নাচিয়ে। এদের নাচই এবারে দেবতার কাছে পূজার অর্ঘ্যরূপে উপস্থিত করা হবে।

বন্ধুটি আরও বললেন, সবক'টি মেয়ে এই শহরের নয়, রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছে। একটি মেয়ে রাজপরিবারের, একটি এ-রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তার কন্যা, একটি মেয়ে কোনো-এক গ্রামের মোড়লের দ্বারা প্রেরিত, একটি এ শহরের প্রধান পুরোহিত-পরিবারের ও অপরটি সাধারণ গৃহস্থঘর থেকে বেছে নেওয়া। এরা সকলে এ রাজ্যের নানা অংশের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে নাচের অর্ঘ্য নিবেদন করতে এসেছে। এদের সঙ্গে আছে আরও কয়েকটি মেয়ে, যারা এই দেবতার কাছে কোনো অসুখে বা বিপদে মানত করেছিল যে, এই উৎসবের দিনে তারা দেবতার কাছে তাদের নাচের অর্ঘ্য নিবেদন করবে।

অল্পক্ষণ পরে সার বেঁধে এক দল মেয়ে নানা প্রকার অর্ঘ্য মাথায় করে এসে উপস্থিত, পিছনে তাদের বাজনার দল। একে একে তাদের মাথার অর্ঘ্য মন্দিরের সামনে সাজানো হল। অল্প দূরে অপর-একটি মঞ্চে প্রধান পুরোহিত তাঁর পূজার সামগ্রী নিয়ে বসলেন। স্থানটি নানাপ্রকার অর্ঘ্যের দ্বারা পূর্ণ।

পুরোহিত এক মনে আমাদের দেশের পূজারীদের মত ফুল ঘণ্টা পবিত্র জল প্রভৃতি দ্বারা পূজার কাজ আরম্ভ করলেন। শৈব পূজারীদের মত আঙুলে নানাপ্রকার ভঙ্গি। ইতিমধ্যে অপর পূজারী এক হাতে ঘণ্টা অপর হাতে ধূপ ও নাচিয়ে মেয়ে-কয়টিকে নিয়ে প্রধান দেবতার মন্দিরের চারদিকে প্রদক্ষিণ শুরু করলেন। শান্তমূর্তি পূজারী আপন মনে ধ্যানস্থ চিত্তে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন, পিছনে চলেছে নাচের

ভঙ্গিতে মেয়ে-কয়টি। নাচটি ছিল অতি সহজ অথচ স্থন্দর। প্রত্যেকটি মেয়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত, যেন তাদের নাচে কোনো বিঘ্ন না আসে— এই রকম শঙ্কিত মনোভাব। এই ভাবটিই এই নাচের দর্শনীয় বা উপলব্ধি করার বিষয়। পাশেই নাচের সঙ্গে মিল রেখে অতি সহজ স্থরের একটি বাজনা বাজছিল কয়েকটি গামেলান-যন্ত্রে, তার মধ্যে দুটি কাঁশার পাতের ও বাকিগুলি বাঁশের।

তিন বার প্রদক্ষিণের পর বালিকারা সকলে মন্দিরের সামনে দেবতার দিকে মুখ রেখে হাতজোড় করে প্রণাম করল। পূজারী মঙ্গলঘটের পবিত্র জল তাদের মাথায় প্রথমে ছিটিয়ে দিলেন, সঙ্গেসঙ্গে সমবেত জনতার দিকেও ছিটিয়ে দিতে লাগলেন।

এই দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নাচ-গানকে এরা যে কত বড় স্থান দিয়েছে এদের জীবনে, তাই দেখানো। নাচ-গানের চর্চা এদের ধর্মচর্চার অঙ্গ। ছবি-আঁকায়, মূর্তি-গড়ায়, মন্দির-রচনায়, সর্বত্রই দেখা যায় সেই আদর্শ। প্রত্যেকটি শিল্প এখনও এ দেশে জীবন্ত। হয়তো অনেকে বলবেন, আজকাল শিল্পধারার অনেক অবনতি হয়েছে। তাহলেও এই দরিদ্র পল্লীবাসীদের চিত্তে যে সরসতা আছে অন্য কোনো দেশের দরিদ্র অধিবাসীদের ভিতরে তা আছে কি না জানি নে।

নাচ-বাজনা এ দেশের সকলেরই আনন্দের বস্তু, এ কথা আরম্ভেই বলেছি। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে মাঝরাত পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই শুনতে পাওয়া যাবে গামেলান-সংগীত। বিদেশিরা শুনে হয়তো ভাববে, বোধ হয় কোথাও কোনো বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে গান-বাজনা বা নাচ হচ্ছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা নয়। হয়তো দেখা যাবে গ্রামের নৃত্যশালায় বা আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত সাধারণের কোনো সম্মিলন-স্থলে গ্রামের বালক ও যুবকেরা আপন মনে গামেলান-সংগীত অভ্যাস করছে, নাহয় তো নাচের মহড়া চলেছে।

এখানে বলা প্রয়োজন, প্রত্যেক গ্রামেই একটি সর্বসাধারণের একত্র হবার স্থান গ্রামবাসীরা সকলে মিলে তৈরি করে। এটি গ্রামের একান্ত

আবশ্যক স্থান। গ্রামের যাবতীয় কাজকর্মে, বিচার-আলোচনায় সকলে এখানে একত্র হয়। এই স্থানটি নৃত্যগীতের একটি প্রধান আড্ডা। গ্রামের গামেলান-যন্ত্র, নাচের সাজ ইত্যাদি এখানে একটি ঘরে সব সময় মজুত থাকে। এসবই গ্রামের সর্বসাধারণের সম্পত্তি, সকলের সাহায্যেই এসব তৈরি হয়েছে। গ্রামে ভালো নাচিয়ে তৈরি করা, গামেলান-সংগীতের ভালো দল থাকা সব গ্রামেরই একটি বিশেষ গৌরবের বস্তু।

সন্ধ্যাবেলায় সারাদিনের পরিশ্রমের পর, গ্রামের চাষী-মজুর ইত্যাদি থেকে উচ্চবংশের ছেলে পর্যন্ত সকলে একসঙ্গে জড়ো হয় এই সংগীত-শালায়, বাজনা-অভ্যাস নাচ-অভ্যাস এবং নূতন কিছু করার আলোচনা চলে। এইখানে এরা এই গান-বাজনা ও নাচের ভিতর দিয়ে দিনের সব পরিশ্রম যেন সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

দেনপাশার শহর থেকে কত রাত্রে গেছি পাশের গ্রামে, তাদের এই নৃত্যগীতের অভ্যাস দেখতে। দেখেছি, বালক ও যুবকরা তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে। এইখানে বৃদ্ধেরা থাকে না, একজন দলপতি আছেন দেখলাম। তিনি নানাভাবে শিক্ষার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। কোনো রাত্রে নৃত্যাভিনয়ের কোনো বিশেষ অংশের মহড়া হল, প্রায় সব প্রধান প্রধান প্রবীণ নাচিয়েরা উপস্থিত। নানা ভাবে পরামর্শ চলেছে কি ভাবে গল্পটিকে খাড়া করা যায়। কোনো রাত্রে দেখি, বালক-বালিকাদের কোনো বিশেষ নাচ গামেলান-সংগীতের সঙ্গে শেখানো হচ্ছে। যদিও তারা বেশ পটু, তবু এতটুকুও খুঁত রাখতে দিতে প্রবীণেরা রাজি নন।

এখন এ দেশের প্রসিদ্ধ লেগং নৃত্য সম্বন্ধে বলি। নাচ হিসাবে এইটি কি দেশি কি বিদেশি সকলেরই উপভোগের বস্তু। এ নাচটি এ দেশের একটি প্রাচীন নাচ। সাধারণত জনসাধারণের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই এর সৃষ্টি। এ দেশের সকলের বিশ্বাস, এ নাচটির উৎপত্তি পূজা-নৃত্য শ্যাংয়াং রজ্জাং ও গাম্ভু নামে একটি প্রাচীন নৃত্যাভিনয় থেকে। এই তিনটি নাচের ধরন থেকে যা সুন্দর তাই যেন ছেঁকে নিয়ে লেগং নাচ তৈরি হয়েছে।

এ নাচের উৎপত্তির বিষয়ে একটি গল্প এ দেশের বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায় : কোনো-এক সময়ে এ দেশের এক নৃপতির কয়েকটি নৃত্যকুশলা রানী ছিল। এক বার রাজার হঠাৎ ইচ্ছে হল তিনি তাঁর রানীদের নাচ দেখবেন। রাজার ইচ্ছায় তক্ষুনি নাচ শুরু হল। এ দেশের প্রাচীন ভাষায় লেগং কথার সোজা মানে হল—নাচ কর, অর্থাৎ নাচের অনুরোধ জানানো। তাই থেকেই এ নাচের নামকরণ হয়েছে। এই নাচে রানীরা চেষ্টা করেছিল রাজার মনোরঞ্জন করতে ; রাজার মনও, শোনা যায়, রানীদের সুন্দর নৃত্যে মুগ্ধ হয়েছিল।

এ নাচটি যে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যে, তা দেখলেই বোঝা যায়। চোখের বঙ্কিম দৃষ্টি, মুখের হাসি, দ্রুত লয়ে ঘাড়ের কাজ, এ নাচে আছে ; কোমরের দোলা দেখলাম এ দেশের সব নাচেই প্রায় চলতি। শোনা যায়, এই ভঙ্গিটি নাকি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নাচটি দেখতে ভালো লাগে। তার কারণ, এই নাচ যারা দেখায় তারা নিতান্ত বালিকা, নাচের প্রচলিত অঙ্গভঙ্গি-গুলিকে তারা সাধারণ নৃত্যরীতি হিসাবেই দেখিয়ে যায়, তার বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে তারা সজাগ বা সচেতন নয়, কাজেই দর্শকের কাছে নৃত্যই সর্বপ্রধান হয়ে থাকে।

এই লেগং নাচে সাধারণত তিনটি মেয়ে নাচে। এ নাচের ধরন প্রধানত কোণাকাটা (angular), হাতের ভঙ্গির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় ; এদিকে দেহের ভিতর দিয়ে সব সময়েই যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মনিপুরী নাচের মত হাতের ভঙ্গি, দেহের ভঙ্গি ও মাথা সব যেন এক হয়ে চলতে থাকে। পায়ের তাল বা কাজ সহজ, কিন্তু খুব দ্রুত লয়ে পা ফেলে নাচতে হয়। হাতের দেহের ও মাথার ভঙ্গি দিয়ে সেদিকটা তারা ফুটিয়ে তুলেছে। দেখে মনে হয়, তাদের কাছে যেন এটা অতি সাধারণ খেলার মত।

এই নাচটা বিশেষভাবে ভঙ্গি-প্রধান। পা হাত দেহ মাথা ও মুখ, সব মিলিয়ে যে যতখানি ভালো সামঞ্জস্য রেখে নিখুঁতভাবে নাচতে

পারবে, সেই হবে সবচেয়ে ভালো নর্তক বা নর্তকী। শিক্ষকেরা ভঙ্গির দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখেন, যেন কোথাও শৈথিল্য প্রকাশ না পায়। প্রত্যেক অঙ্গ যেন অন্য অঙ্গের সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্য রেখে চলে।

কথাটা আর-একটু বিশদ ভাবে বলা প্রয়োজন। আমাদের দেশের আধুনিক নর্তক-নর্তকীরা অনেকেই শিব-নৃত্য দেখান। এক বার অন্ততঃ তাঁরা নটরাজের বিখ্যাত নাচের ভঙ্গিটি দর্শকদের না দেখিয়ে খুশি হন না। কিন্তু সেই মূর্তিকে নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে প্রায় কাউকে দেখা যায় না। কেউ হয়তো দাঁড়ান বেশি খাড়া হয়ে, কেউ হয়ে যান বেশি কুঁজো; কারু পা যতটা লম্বা করা প্রয়োজন তা করেন না। যদি আমরা মেনে নি যে, নাচের ভঙ্গি হিসাবে নটরাজের ভঙ্গির ব্যালান্স নিখুঁত, তাহলে বলতে হয় এখনও পর্যন্ত একটি নাচিয়েও পারেন নি নিখুঁতভাবে নটরাজের ভঙ্গিকে আয়ত্ত করতে।

এই ব্যালান্সের দিক থেকে এরা অত্যন্ত সতর্ক। বলির সর্বত্রই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি নাচিয়ের প্রত্যেকটি ভঙ্গি সেই নাচের দিক থেকে নিখুঁত। কি ভাবে পা ফেলে দাঁড়ালে দেহ হাত ও মাথা সামঞ্জস্য রাখতে পারে, সেদিকে এরা বিশেষ লক্ষ্য রাখে। দ্রুত ছন্দের তালে যখন নাচছে তখনও এর ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় না। এতখানি পাকা শিক্ষা তারা পায় অল্পবয়সেই। এ কথা উল্লেখ-যোগ্য যে, এরা কখনো পায়ে ঘুঙুর ব্যবহার করে না।

এ নাচের গঠনপদ্ধতি হল গামেলান-সংগীতকে লক্ষ্য ক'রে, আমাদের দেশের কথক-নাচিয়েরা যেমন তবলা অথবা পাখোয়াজের তালের সঙ্গে মিল রেখে নাচ দেখায়। এদের নাচ হল সমগ্র গামেলান-সংগীতের সঙ্গে মিল রেখে, গামেলান-সংগীতকে নাচের ভিতর দিয়ে এরা ফুটিয়ে তোলে।

গামেলান-বাজনার পদ্ধতিতে বেশ বৈচিত্র্য আছে। কখনো দ্রুত লয়ে, কখনো ঢিমা লয়ে, কখনো খুব মৃদু শব্দে, কখনো প্রচণ্ড জোরে,

কখনো একটি যন্ত্র, আবার কখনো অনেকগুলি একসঙ্গে বাজে। বাজনার ছন্দ এক লয় থেকে অন্য লয়ে প্রায়ই বদল হচ্ছে। কখনো হঠাৎ ঢিমা লয় থেকে চলে গেল দ্রুত লয়ে, আবার তখনি একেবারে সব যন্ত্র একসঙ্গে চুপ, কোনো শব্দ নেই, এবং পর-মুহূর্তেই সশব্দে আবার আর-এক লয়ে বাজনা শুরু হল। সবচেয়ে শুনতে ভালো লাগে, যখন একদল বাজিয়ে তাদের যন্ত্রে কেবলমাত্র সুরে ছন্দ রেখে চলে, দুই অথবা তিনটি সুরের উপরে; আর অপর দল, আমাদের দেশের যন্ত্রসংগীতের ঝালাতে আলাপ করার যে রীতি, কতকটা সেই ধরনে নানা প্রকার ছন্দে একই রাগিণী বাজিয়ে যায়। এদিকে এই বৈচিত্র্যের মূল হচ্ছে এদের কাঠের ঢোল। এই দুই ঢোলের বাজনাই সব বাজিয়েদের ঠিক রাখছে। সঙ্গে আছে বড় বড় কাঁসার করতাল, ঢোলের বাজনার ছন্দে মিলিয়ে সেগুলি ঝম্‌ঝম্ শব্দে বাজে। কিন্তু তাই ব'লে যদি একে আমরা তুলনা করি আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে চলতি করতালের বাজনার সঙ্গে, তাহলে অন্যায় করা হবে। এরা গামেলান-সংগীতের বাজনার সঙ্গে মিল রেখে শব্দকে জোর করে বা মৃদু করে। সঙ্গে একতারের রবাব ও বাঁশের বাঁশিও বাজে, কিন্তু এ-দুটি যন্ত্র কণ্ঠসংগীতের সঙ্গেই বেশি ব্যবহৃত হয়, নৃত্যসংগীতে দেখা যায় না।

এদের সব নৃত্যসংগীত বা নাচ চার মাত্রার ছন্দে এবং সাধারণত সবই দ্রুত লয়ে। মধ্য লয়ে মাঝেমাঝে আসে, কিন্তু ঢিমা লয় এদের নাচে কখনও দেখি নি।

লেগং নাচ সম্বন্ধে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। অভিনেতাদের সাজের রকমারি পার্থক্য বা বেশি সংখ্যক অভিনেতার আবশ্যকতা কিম্বা কোনো প্রকার সজ্জিত রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন এরা একেবারেই বোধ করে না। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, সন্ধ্যাবেলায়, কেরোসিনের আলোয় চারি দিকে গ্রামের দর্শকরা ঘিরে বসে গেছে, চারি দিকের অন্ধকার গাছপালার মধ্যে নাচ যেন ছবির মত দেখতে লাগে। সুন্দর কারুকার্য-

করা নাচের সাজগুলি তখন যেন আরও সুন্দর নানা রঙের খেলা দেখায়।

এই নাচের সঙ্গে এ দেশের একটি আধা ঐতিহাসিক গল্প জড়িত আছে। আগে থেকে বিদেশি দর্শকরা সে গল্পের বিষয়বস্তু ভালো ক'রে না জেনে রাখলে কোনো প্রকার মিল খুঁজে পাবে না। গল্পটা অবশ্য উপলক্ষ্য মাত্র।

গল্পটি হচ্ছে: কেদরী নামে একটি রাজ্যের রাজকুমারী রংকেশরীকে বিবাহ করবার জন্য লাসেম নামে এক দুর্দান্ত নরপতি জোর ক'রে ধরে নিয়ে আসে তার পিতার কাছ থেকে। রংকেশরী বিবাহে নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে, লাসেমের প্রেমে ধরা দিতে রাজি হয় না। এই রকম যখন অবস্থা তখন রাজার ডাক পড়ে যুদ্ধযাত্রায়। বিদায়ের পূর্বে রাজা পুনরায় রাজকুমারীকে অনুরোধ করে তার প্রতি সদয় হতে; যুদ্ধযাত্রার পথে রাজকুমারীর প্রেমকে সে শুভ বলে মনে করবে। তবু রাজকুমারী রাজার প্রেমে ধরা দেয় না, আবেদন ব্যর্থ হয়। ক্রোধে রাজা ভয় দেখায়, রাজকুমারীর পিতাকে সে হত্যা করবে। যুদ্ধযাত্রার পথে এক বিরাট দাঁড়কাক তার পথ আগলিয়ে তার যাত্রার অশুভ লক্ষণের কারণ হয়। রাজা পাখিকে হত্যা ক'রে যুদ্ধে যায়, কিন্তু সেই অশুভ লক্ষণই রাজার যুদ্ধে মৃত্যুর কারণ হয়।

নৃত্যাভিনয়ের আরম্ভে, চুপ ক'রে তিনটি মেয়ে ব'সে আছে গামেলান-বাজনার সামনে। সকলের সাজই খুব উজ্জ্বল। মাথায় সোনালি রঙের চামড়ার মুকুট, কাঠের কারুকার্য-করা ছোট ফ্রেমে নানা রঙের কাঁচ বসানো। পিছনের চামড়াটি ত্রিকোণ হয়ে উপরের দিকে উঠেছে। মাথার দু পাশের মুকুটে নানা রঙের ফুল ছোট ডালসুদ্ধ লাগানো। কখনো কখনো সোনার পাতে তৈরি ফুলও দেখা যায়। পিছন দিকে খোলা চুল ঝুলিয়ে দেয়, তাতে চাঁপা ফুল জড়ানো। বুকে ও কাঁধে থাকে একসঙ্গে একটি চামড়ার নকশা-কাটা, একই পদ্ধতির সোনালি সাজ, হাতেও তাই। পরনে রঙিন কাপড়ের

উপর এদেশি প্রথায় সোনালি রঙের নকশা-কাটা আঁটসাঁট লুঙ্গির মত কাপড়, বেশ মোটা। কোমর থেকে বুক পর্যন্ত চার আঙুল চওড়া একই ধরনের নকশা-কাটা রঙিন কাপড়ের বেশ লম্বা একটি ফিতে, খুব আঁট করে প্যাঁচানো। কোমরে দু পাশ থেকে দুটি আলাদা রঙিন চাদর ঝুলতে থাকে। কোমরে আলাদা একটি চামড়ার গয়না। বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর-একটি চামড়ার নকশা-কাটা সাজ ঝুলতে থাকে। গায়ে আঁট নকশা-কাটা জামা, গায়ের অংশটা দেখা যায় না চামড়ার সাজের দরুন। জামার হাতা হাতের সঙ্গে সম্পূর্ণ লেপ্‌টে থাকে।

এরা মুখে এদেশি এক রকম ঈষৎ হলদে রং মাখে, ভ্রূ কালো রঙে ভালো ক'রে আঁকে, ঠোঁটে অল্প লাল রং লাগায়, দুই ভ্রূর মাঝখানে দেয় সাদা রঙের মোটা একটি টিপ। এ দেশে সব মেয়েরই কানের গয়না পরার রীতি আছে। গয়নাগুলি সাধারণতঃ বেশ মোটা নলের মত দেখতে, দু-তিন ইঞ্চি লম্বা। অবস্থাপন্ন লোকেরা সোনার তৈরি গয়না ব্যবহার করে, গরিবরা করে শুকনো সাদা নারকেল-পাতার তৈরি নলের মত গয়না। এই নাচিয়েদের কানের ফুটোতে সোনার কাজ করা নল থাকে, সেটি দেখতে বেশ লাগে।

এই তিনটি বালিকার সাজের মধ্যে মাঝেরটির সাজ অপেক্ষাকৃত সাধারণ। এই মেয়েটি নাচের সূত্রধার। একে এরা বলে চন্‌ডং। গামেলান-বাজনার সঙ্গে এ খালি-হাতে একটি উদ্বোধন-নৃত্য করে। তার পর কিছু দূরে মাটি থেকে এদেশি প্রথায় নকশা-কাটা ও কাপড়ে তৈরি দুটি জাপানি হাতপাখা তুলে নেয়। ইতিমধ্যে বাকি দুটি মেয়ে নাচ আরম্ভ করে। একসঙ্গে নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে এসে দুটি পাখা দু-জনে অপর বালিকার দু-হাত থেকে তুলে নেয়। এদুটিকেই এদেশে বলে লেগং। এ দেশের মেয়েদের নাচে দাঁড়াবার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে যা ভারতে বা ব্রহ্মদেশে কোথাও দেখি নি। এদের দাঁড়াবার ভঙ্গি অর্ধেকটা হাঁটু মুড়ে এবং যতটা সম্ভব পিঠের মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে।

এই ভাবেই তাদের সব সময় নাচতে হয়। একেবারে পা বা শরীর সোজা করে নাচতে কখনও কোথাও দেখি নি। কটিদেশ থেকে দেহ ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে।

পাখা-হাতে এই মেয়ে দুটি নাচতে শুরু করল, একই নিয়মে এক পদ্ধতিতে। প্রথম মেয়েটি কিছুক্ষণ অন্য দুটির সঙ্গে নাচবার পর বিদায় নেয়। এ দুটি মেয়ে পাখা-হাতে যত প্রকারে সম্ভব ঘুরে এপাশে-ওপাশে দ্রুত পদক্ষেপে নেচে যায়। এই নাচ পর্যন্ত উদ্বোধন-নৃত্য চলতে থাকে। এর পর শুরু হয় গল্পের অংশ। যেখানে, যে-গ্রামের দলেরই নাচ দেখেছি, সেখানেই লক্ষ্য করেছি দুটি মেয়ের নাচের মিল এত চমৎকার যে মুখে পার্থক্য না থাকলে হয়তো মনে এক বার সন্দেহ হত যে একই নাচিয়ে দুই হয়ে নাচছে, শিক্ষাদানের পদ্ধতি এমনই নিখুঁত।

দুটি মেয়েই গল্পের রাজা ও রাজকুমারী সাজে; নাচের পদ্ধতির কোনো বিশেষ পার্থক্য হয় না, এবং এবারে অভিনয়ের দিকেই ঝোঁক দেয় বেশি। নৃত্যাভিনয় আরম্ভ হয় রাজকুমারীর কাছ থেকে রাজা লাসেমের বিদায় নেবার অভিনয় থেকে। রাজকুমারী বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বিদায় নেয় রঙ্গভূমি থেকে ও গামেলান-দলের মধ্যে বিশ্রাম নেয়।

এর পরে আসে প্রথম মেয়েটি, চামড়ায় আঁকা দুটি পাখির পাখা হাতে নিয়ে। এই হচ্ছে গল্পের দাঁড়কাক। পাখির পাখা হাতে নাচটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। দেনপাশার শহরের পাশের গ্রামে রেন্‌ডি নামে একটি ছেলে এই পাখির নাচ করে অতি চমৎকার। মাটিতে হাঁটু মুড়ে পা পিছনে দিয়ে বসে, লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। দুই হাতে পাখির মত পাখা ঝাপ্‌টে যা নাচ দেখায় তা রীতিমত দুঃসাধ্য।

এই পাখিটি রাজাকে আক্রমণ ক'রে পাখার ঝাপটায় রাজাকে অস্থির ক'রে তোলে, রাজা অস্ত্রের দ্বারা পাখির সঙ্গে যুদ্ধ করে, হাতের পাখা তখন হয় রাজার তলোয়ার। পাখির মৃত্যু আর দর্শককে দেখানো হয় না, পাখি পলায়ন করে। এইখানে নৃত্যাভিনয়ের শেষ।

গল্পটিকে দুই ভাগ ক'রে নাচের মধ্য দিয়ে তা বর্ণনা করে। গল্পের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা ও কবিত্ব দর্শককে কল্পনায় মিলিয়ে দেখতে হবে। এক বৃদ্ধ কথক থাকে গামেলান-সংগীতের দলে, তার কাজ হল আগাগোড়া গল্পটি নানা প্রকার কবিত্বপূর্ণ কথার দ্বারা প্রকাশ করা। এই কারণেই কথকের কথা আর নাচিয়ের নাচ উভয়কে মিলিয়ে না দেখলে এ নৃত্যাভিনয়ের ব্যাপার বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এখানে রাজার সাজ ও রানীর সাজে কোনো পার্থক্য নেই, পাখির সাজেও নেই, কেবল হাতের দুটি পাখা ছাড়া। এ নাচের কোনো পর্দা নেই, আড়ালের দরকারও এরা বোধ করে না।

এটি নৃত্যাভিনয় ব'লে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, কথক গানের সুরে গল্পটি বলবে। আসলে তা নয়, কথক সাধারণ কথা বলার ভঙ্গিতে তা বলতে থাকে যাতে দর্শক সব শুনতে পায়। কিন্তু গল্পের চরিত্র অনুসারে কথক গলার স্বর পরিবর্তন করে অভিনয়ের ঢঙে। যেখানে করুণ সেখানে সে নিজের গলায়ও কোমলতা আনতে চেষ্টা করে। এ দেশের অন্যান্য নৃত্যাভিনয়ে অভিনেতারা নিজেরাই গান গায়, কথা বলে ; কিন্তু এই নাচে তা হয় না।

এ দেশে মেয়েদের মধ্যে সাধারণত অঙ্গাবরণ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত নেই। কিন্তু নাচের সময় এরা এক-এক নাচে এক-এক রকমের অঙ্গাবরণ ব্যবহার করে।

জাভা ও বলির নারী নৃত্যপদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জাভার নৃত্য স্থাপত্যধর্মী ও বলির নৃত্য কবিত্বধর্মী। জাভার নাচের ধরন ধীর স্থির ও গম্ভীর। বলির নাচের প্রকৃতি বেশ চঞ্চল, অথচ প্রাণবান। বলির স্বভাবের ছাপ নাচের মধ্যে সুস্পষ্ট। এরা স্বভাবতই আমোদপ্রিয় জাত। জাভার, বিশেষত মধ্যজাভার, লোকেরা অনেকটা শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির। তাই এদের নাচেও সেই ধীর গম্ভীরতা।

# কবিয়ার নৃত্য

নৃত্যকলায় বলির সৃষ্টিশীল শিল্পী-মন কিভাবে কাজ করছে তার কিছু পরিচয় এবার দিই।

বলির নৃত্যাভিনয় ও গামেলান-সংগীত একান্তভাবেই তাদের সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজনের বিষয়। এ দুটি না হলে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হয় না। এসব নৃত্য বা নৃত্যাভিনয় এবং গামেলান-সংগীত অনেক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন ও নূতনত্ব এসেছে। তাদের সকল চেষ্টার মধ্যেই সব সময়ে নূতন সৃষ্টির প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে, ক্রমাগত একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করে তারা খুশি থাকে নি।

বলির প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যকলা অভিনয়প্রধান। কিন্তু তা ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে বলির নৃত্য দক্ষিণভারতের কথাকলি-মুদ্রাভিনয়ের মত। এরা যতটা সম্ভব দেহের ভঙ্গির সঙ্গে ভাবের মিল রাখবার চেষ্টা করে। অভিনেতারা স্বাভাবিক ভাবে প্রাচীন বলি ভাষায় কথা ব'লে অভিনয় করে। তালের সঙ্গে মাঝে মাঝে পায়ের ছন্দ, হাতের ও দেহের সহজ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক নড়ে চড়ে বেড়ায়। অভিনয়ই এর মুখ্য উদ্দেশ্য, পায়ের ছন্দটা এখানে গৌণ। এমন কি গামেলান-সংগীতেরও সেখানে বিশেষ স্থান নেই, তার ব্যবহার খুবই সামান্য।

এই ধরনের নৃত্যকলার পরিবর্তন প্রথম আরম্ভ হয় লেগং নাচের ভিতর দিয়ে; এখানে নৃত্যকলা অনেকখানি মুক্তি পেল। সেই সঙ্গে গামেলান-সংগীতেরও অনেক পরিবর্তন হল। এ নাচে দেহভঙ্গির সঙ্গে ভাবের একটা মিলন সাধনের চেষ্টা শুরু হয় গামেলান-সংগীতকে লক্ষ্য করে। আগেই বলেছি, এই নাচের সঙ্গে একটি গল্পের যোগ

আছে এবং একে নৃত্যাভিনয়ের দলে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু এ নৃত্যাভিনয়ে অভিনেতারা একেবারেই কথা বলে না। এ নাচের সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের আকাশ-পাতাল তফাত।

যদিও-এই পরিবর্তন নিতান্ত আধুনিক কালে হয় নি, তবুও বর্তমান দ্রুতগামী জগতের মানুষের কাছে এ-নাচ বিশেষ সমাদরের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে, বলির একটি শ্রেষ্ঠ নাচ হিসাবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে।

কিন্তু এ পর্যন্ত এসেই তারা থেমে যায় নি, এর পরেও গামেলান-সংগীতে পরিবর্তনের চেষ্টা চলতে লাগল। এদেশে যত প্রকার নৃত্য বা নৃত্যাভিনয় আছে, সব নৃত্যের সময়েই গামেলান-যন্ত্র ব্যবহারের একটা নিয়ম দেখা যায়। কোনো নাচে মাত্র চারটি যন্ত্র বাজে, কোনো নাচে থাকে কেবল ঢোল করতাল বাঁশি ও রবাব, কোনো নাচে ঢোল বাজাবার নিয়ম ডান হাতে কাঠি নিয়ে। এই ভাবে বিভিন্ন নৃত্যে বিভিন্ন রকমে গামেলান-যন্ত্রের ব্যবহার হয়। বিভিন্ন নাচে যন্ত্রসংগীতের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন লেগং নাচে গামেলান-যন্ত্রের সংখ্যা প্রায় কুড়িটির উপর; এই যন্ত্রগুলির সমষ্টিগত বাজনার নাম পেলেগোন্‌গান। অনেক সময় দেখা গেছে বাজনার নাম অনুসারে নাচের নামকরণ হয়েছে। তার একটি বড় উদাহরণ হল গংকবিয়ার বাজনা।

আধুনিক বলি-নৃত্য গামেলান-সংগীতের একান্ত অনুগত, সংগীত যেভাবে চলবে তাকেও সেভাবে চলতে হয়। গংকবিয়ার বাজনার প্রচলন হল গংগেডে নামে এক প্রাচীন পদ্ধতির বাজনা থেকে। শোনা যায়, রচয়িতা সেই বাজনার নানা অংশকে বেছে বেছে কবিয়ার-বাজনার জন্যে সাজিয়ে নিয়েছিলেন, এবং রচয়িতা নিজের বুদ্ধি খাটিয়েও অনেক কিছু তাতে যোগ ক'রে দিয়েছিলেন। এই বাজনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যন্ত্র এরা ব্যবহার করে, সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশটি। সে দেশের আর কোনো নৃত্যে বা নৃত্যাভিনয়ে এত বাজনা

ব্যবহার করতে দেখা যায় না। এই গংকবিয়ার-বাজনার সঙ্গে লেগং নাচের টেকনিককে মেলানোর চেষ্টা হয়েছিল। সেই নাচের নাম রাখল কবিয়ার। এই নাচ ছোট দুটি মেয়েকে করতে দেখেছি উত্তর-বলির এক বিখ্যাত গামেলান-দলে, এবং পূর্ব-বলির এক গ্রামে।

এ নাচও অল্পবয়স্ক বালকবালিকার মধ্যেই আবদ্ধ। কবিয়ার নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একসঙ্গে কোনো গল্পের প্রয়োজন নাচিয়েরা অনুভব করে নি। এরা নাচটিকে সম্পূর্ণ একটি গানের মত করে তৈরি করল, এ নাচের মূল উদ্দেশ্য হল কেবল গামেলান-সংগীতকে নাচের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। এই আদর্শেই আধুনিক বলির নৃত্যশিল্প প্রসার লাভ করছে, প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে এইখানেই তার মূল প্রভেদ। লেগং বা কবিয়ার নাচ ঠিক কোন্ সময়ে বা কার দ্বারা প্রথম প্রবর্তিত হয় এ খবর আজকাল কেউ দিতে পারে না। এটা এখন ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত মহাযুদ্ধের পরে আর-একটি নূতন পরিবর্তন এল বলির নৃত্যধারায়। এ নাচের প্রবর্তক মধ্যবলির একটি গ্রাম্য যুবক, তার নাম মারিয়ো। এদেশে সব গ্রামেই নাচের ও গামেলান-দল তৈরি করা গ্রামবাসীদের একটি বিশেষ কর্তব্য; এই বালকের গ্রামে সেই রকম একটি নাচের ও বাজনার দল ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন গামেলান-সংগীত ও নাচের অভ্যাস চলত, এই বালকটিও সেখানে যোগ দিত। প্রত্যেক গ্রামেই নাচ-বাজনা শিক্ষার সুযোগ প্রত্যেকেই পায়, মারিয়ো সে সুযোগ গ্রহণ করেছিল, এবং গ্রামের নাচ-গানের নেতার পরিচালনায় নৃত্যে ও বাজনায় সে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠল।

এই বালক যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন আর গতানুগতিক নৃত্যপদ্ধতির পুনরাবৃত্তিতে সে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছিল না। এখন তার মনের সাহসও অনেক বেড়েছে, সে নির্ভয়ে নূতন নৃত্যরচনায় মনোযোগ দিল।

লেগং নাচের পেলেগোন্‌গান্ সংগীতে আমরা পাই প্রাচীন পদ্ধতির ছায়া। প্রাচীন পদ্ধতির মত ঢিমা লয়ের বাজনাও মাঝে মাঝে শোনা যায়, আবার এর ভিতর দিয়ে মাধুর্যের প্রকাশও বেশ ফুটে ওঠে। গংকবিয়ার-সংগীত অপেক্ষাকৃত জোরালো। এই শেষোক্ত নাচের গামেলান-সংগীতই মারিয়োর নূতন নাচের ভিত্তি।

এ দেশের সব গামেলান-সংগীতের রাগিণী বা সুর একটি মাত্র। এই একটি সুরকেই কোন্ দল কত প্রকারে বাজাতে পারে বা বৈচিত্র্য দান করতে পারে সেই চেষ্টাই সুরকার সর্বদা ক'রে থাকে। আমাদের দেশের রাগ-রাগিণী আমরা যখন যন্ত্রসংগীতে বা কণ্ঠসংগীতে শুনি, তখন দেখি, বাজিয়ে বা গাইয়ে দুই লাইনের গৎ বাজানোর পরে কত রকমের ছন্দ, কত রকমের তান, কত রকমের দুরূহ কাজ বাজনায় বা গানে প্রকাশ ক'রে থাকেন। যিনি যত বেশি এ-ভাবে বৈচিত্র্য আনতে পারেন তিনিই তত বড় গাইয়ে বা বাজিয়ে।

বলির গামেলান-সংগীতের পদ্ধতি ঠিক এই ধরনের, যে বৈচিত্র্যের কথা বলছিলাম তা ঠিক এই পথ ধরেই তারা দেখাবার চেষ্টা ক'রে থাকে। তফাত হচ্ছে, কেবল একই গতে যেখানে-সেখানে বিচিত্র রকমের লয়ের পরিবর্তন, যা আমাদের ভারতীয় সংগীতে আমরা দেখি না। পেলেগোন্‌গান-সংগীতের পর কবিয়ার-সংগীতই এই দিক থেকে এ দেশের গামেলান-সংগীতে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করেছে।

মারিয়োর নূতন রচনায় গামেলান-সংগীতের জ্ঞান তাকে অনেক সাহায্য করেছিল। তার মাথায় দিনরাত গামেলান-সংগীতের নানা প্রকার ছন্দ, তান-বৈচিত্র্য ঘুরছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবেছে, এর সঙ্গে মিলিয়ে কি ক'রে নূতন প্রণালীতে নাচ তৈরি করা যায়। এ নাচের নামের কোনো পরিবর্তন সে করে নি, কবিয়ার নামই রেখেছে। কিন্তু নাচের ধরনে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আনল, তা হচ্ছে এই: এ নাচে নাচিয়ে এক জন, নাচের সময় সে কখনো দাঁড়ায় না, মাটিতে পা মুড়ে ব'সে নাচে। অল্প বয়স ও বেশি বয়সের কোনো পার্থক্য

এ নাচে মারিয়ো রাখল না, যদি শক্তি থাকে সকলেই এ নাচের উপযুক্ত ব'লে গণ্য হবে। নাচিয়ের কাপড় পরার রীতি— কাছা-কোঁচা না দিয়ে, এক দিকের আঁচল থাকে অনেকখানি বেরিয়ে; আর-একটি সোনালি কাজ-করা চার-পাঁচ আঙুল চওড়া ও পাঁচ হাত লম্বা মোটা কাপড় কোমর থেকে বুক পর্যন্ত খুব টান ক'রে পেঁচিয়ে বাঁধে। মারিয়ো নিজে গায়ে কোনো গয়না দেওয়া পছন্দ করে না, কিন্তু তার চেলাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল নানা রকমের গয়না ব্যবহার আরম্ভ করেছে। মাথায় থাকে বলি দেশের প্রথায় এক রকমের ছোট পাগড়ি: বাতিকের তৈরি, সোনালি কাজ করা; ডান কানে ও মাথায় বড় রঙিন ফুল ব্যবহার করতে দেখা যায়, জবা ফুলের চলনটাই দেখলাম বেশি। অনেকে কোনো ফুলই দেয় না। অন্যান্য যে-কোনো নাচের সঙ্গে তুলনায় এ নাচের সাজ অতি সাধারণ। এতে পুরুষোচিত দেহ-সৌন্দর্য প্রধানত দেখবার বিষয়।

এ নাচে মারিয়ো যাবতীয় পুরুষ-নৃত্যের সুন্দর ভঙ্গির সঙ্গে লেগং নাচের কলাকৌশলকে মিলিয়ে নিল। এই নূতন নাচের পূর্বে গামেলান-সংগীতের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, বিশেষত জোরের দিক থেকে। নাচ তাকেই লক্ষ্য ক'রে গড়ে উঠল, এবং এমন সুন্দর ভাবে মিশে গেল যে নূতন ও অভিনব ব'লে তা সকলেরই মন আকর্ষণ করল।

গামেলান-সংগীতের সঙ্গে নাচকে মিলিয়ে দেবার পূর্বে মারিয়োকে অনেক ভাবতে হয়েছিল যে গামেলান-সংগীতের এই নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে কি ভাব প্রকাশ পায় বা তা শুনে কি ভাব তার মনে উদয় হয়। সেই ভাবে বিচার ক'রে সংগীতকে সে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করল এবং তার সঙ্গে যেখানে যেভাবে দ্রুত মৃদু জোরালো কোমল ইত্যাদি দেহের ও হাতের ভঙ্গি মিলতে পারে সেইভাবে মেলাল।

এই মিলই মারিয়োর নবপ্রবর্তিত নাচের বৈশিষ্ট্য। যে চেষ্টা আগে-কার নাচে আরম্ভ হয়েছিল, সেই চেষ্টা অনেকখানি সফলতা লাভ করল এই নাচের ভিতর দিয়ে। এ নাচ দেখে প্রত্যেকে বুঝতে পারবে যে,

গামেলান্-সংগীতকে প্রকাশ করার জন্যেই এ নাচ তৈরি— সংগীত যেন দেহের ভঙ্গির ভিতর দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করছে।

আজ মারিয়ো বয়সে চল্লিশের কাছাকাছি, যুবা বয়সে এই নাচ তাকে দেখাতে হত নিয়মিতভাবে দেশি-বিদেশি সকলের কাছে। এই নাচের প্রবর্তক হিসাবে সে আজ সর্বত্র সুপরিচিত। এমন খুব কম বিদেশিই আছে যে সে দেশে গিয়ে এই নাচিয়ের নাচ না দেখে ফিরেছে। ইদানীং নাচের জগৎ থেকে মারিয়ো বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে তার গ্রামের নিভৃত নৃত্যশালায় দেশের বালকদের নৃত্যশিক্ষাদানে মগ্ন। তার ছাত্রদের সে কখনো হুবহু নকল করতে বলে না। সে বলে, সে কেবল ধরিয়ে দেবে, তার পর ছাত্ররা তাদের সামর্থ্যমত যতখানি সম্ভব নূতন রচনা করুক।

মারিয়োর নাচ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তার অনেক শিষ্যের নাচ দেখবার সুযোগও আমি পেয়েছি। দেখলাম, তারই কোনো ছাত্র অনেক বিষয়ে গুরুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। গুরুর তাতে দুঃখ নেই, সে যা চেয়েছিল তাই সে দেখতে পেয়েছে তার সেই ছাত্রটির মধ্যে। তার এই শিষ্যটির নাম রাক। গুরুর পরে সে আজ সে দেশে কবিয়ার নাচে বিখ্যাত। অনেক সৌন্দর্য সে বাড়িয়েছে এই নাচে। গামেলান-সংগীতের সঙ্গে নাচের মিল এর কাছে যেন আরও সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে।

মনে পড়ে, যেদিন প্রথম কবিয়ার নাচ দেখি দেনপাশার শহরে— রাত্রিবেলা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আধুনিক কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, চারি দিকে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ, বিদেশিও দেখা গেল অনেক। আসরে দেখলাম একটি যুবক সুন্দর ঘন লাল রঙের সোনালি কাজ করা শাড়ির মত কাপড় পরে ব'সে আছে চুপ ক'রে। দু-পাশে গামেলান-যন্ত্র, সে মাঝখানে। হাতে আছে বর্মী নাচিয়েদের মত হাতপাখা, এদেশি ধরনে কাপড়ে তৈরি। যুবকটি যে ব'সে ব'সেই নাচবে আমি তা মোটেই ভাবি নি। গামেলান-সংগীত বাজছিল। আমি শুনলাম সেটা বাজনায় উদ্বোধন-সংগীত। বাজনা শেষ হল। অল্প পরেই সশব্দে যেই গামেলান-যন্ত্র

ঢোল ও বড় বড় কাঁসার করতালে বাজনা শুরু হল, দেখি, শান্তশিষ্ট যুবকটি ডান হাতে পাখাটিকে খুলে ধরেছে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে, বাঁ হাত বাঁ দিকে সোজা টান হয়ে আছে, আঙ্‌ুলে একটি স্থন্দর মুদ্রা। পিঠ সোজা ও বুক টান করে বাঁ দিকে কাত হয়ে ব'সে বড় বড় চোখে সামনে তাকিয়ে কি যেন দেখছে আশ্চর্য হয়ে, ডান হাতের পাখাটি থরথর করে কাঁপছে।

হঠাৎ বাজনার সঙ্গে এই ভঙ্গি দেখে আমার মনে হল, যুবকটির দেহের ভিতর দিয়ে বুঝি বিদ্যুৎ খেলে গেল। হঠাৎ এত দ্রুত এই ভঙ্গিতে নাচ শুরু হবে, আমি কল্পনা করিতে পারি নি। বাজনার সঙ্গে দ্রুত ভঙ্গির পরিবর্তন এ-নাচের একটা বিশেষ গুণ।

গামেলান-সংগীতের ভিতর কতকগুলি ছোট বা বড় অংশ আছে, যার তুলনা করা যেতে পারে আমাদের দেশের পাখোয়াজের বা খোলের তালের তোড়া বা পড়নের সঙ্গে। মাঝেমাঝে এই ধরনের বাজনার সঙ্গে নাচিয়ের অতি দ্রুত ভঙ্গি দেখবার মত; এই পদ্ধতিই দর্শকদের মন বিশেষ ক'রে আকর্ষণ করে।

বাজনার নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে নানা ভাবে নাচের ভঙ্গি বদল হতে লাগল। মাঝেমাঝে বাঁ হাতে কাপড়ের আঁচলটি বেশ কায়দা করে আঙ্‌ুলের ডগায় তুলে ধ'রে, আধ-বসা অবস্থায় তালের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে কয়েক ফুট এগিয়ে এসে ব'সে পড়ল। কখনও আবার এই ভাবেই একই জায়গায় একটি পাক খেয়ে নিল।

এদিকে একই সঙ্গে মুখের ভাবের বিচিত্র পরিবর্তন দেখবার মত। কখনো মনে হচ্ছে যেন কিছু দূরে কী একটা দেখতে পাচ্ছে, যেন স্পষ্ট নয়, ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করছে। কখনো মনে হল, কি দেখে নাচিয়ে যেন অত্যন্ত ভীত, পরক্ষণেই হাসিমুখ, যেন ভয়ের কিছুই নেই, মিছে ভয়। কখনো মনে হল, যেন চোখের ইঙ্গিতে কাকে সে কি ইশারা করল, যেন কাউকে ডাকছে। আবার কখনও চোখে-মুখে একটা ভাবোন্মত্ততা ফুটে উঠল। এ ধরনের নানা প্রকার অভিনয়ের সঙ্গে হাতে

দেহে মাথায় যত প্রকার ভঙ্গি করা সম্ভব তাই সে ক'রে যাচ্ছে। কখনও ডান হাতে পাখাটিকে এমনভাবে ঘোরাচ্ছে যেন মনে হবে নাচতে নাচতে সে ক্লান্ত, তাই একটু হাওয়া খেয়ে নিল। আর সব সময় দেহে একটা দোলা ও ঘাড়ের কাজ, অর্থাৎ মাথাটিকে বাজনার লয়ে ক্রমাগত এপাশে ওপাশে নাচাবে— আমাদের প্রাচীন নৃত্যশাস্ত্রে যার ব্যবহার কেবল আদিরসাত্মক অভিনয়ের জন্যেই লেখা হয়েছে, বর্তমানে যার পরিচয় আমরা কথাকলি কথক ও বাইজিদের নাচে পাই ; ভারতের বেশির ভাগ আধুনিক নর্তক-নর্তকীরাও এর চর্চা করেন। গামেলান-সংগীত যেভাবে যত রকমে বাজল, নাচিয়ে ঠিক তাকে লক্ষ্য ক'রে সুন্দরভাবে মিলিয়ে নেচে গেল।

একটি বাজনার দলে প্রায় পনেরোটির উপর যন্ত্র থাকে, বাজিয়েরা অভ্যাসে এত পাকা যে কখনো কোনো বাজনায় কাউকে একটুও গোলমাল করতে দেখি নি। এই নাচটি শেষ পর্যন্ত দেখে আমার মনে হল, ইউরোপের আধুনিক ভাব-নৃত্যের দলে একে অনায়াসে স্থান দেওয়া যেতে পারে।

মারিয়ো নাচের সময় কখনো কখনো এমন-সব নূতন ভঙ্গির সৃষ্টি করে যা সে আগে কখনো ভাবে নি। নাচের শেষে সে নিজেও সে-ভঙ্গির বিষয় মনে আনতে পারে না। তাকে প্রশ্ন করলে সে বলে, নাচের সময় গামেলান-সংগীতই যেন তাকে নাচায়, সে যে নিজে গামেলান-সংগীত লক্ষ্য ক'রে নাচছে, এ তার মনেও থাকে না।

কয়েক বৎসর হল কবিয়ার নাচে মারিয়ো একটি নূতন পদ্ধতির আমদানি করেছে, এখনো তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে নি। গামেলান-বাজনার যন্ত্রগুলির ভিতর রেয়ং নামে একটি যন্ত্র আছে। কাঁসার তৈরি তেরোটি ছোট ঘণ্টা, সুরের উঁচুনীচুর উপর লক্ষ্য রেখে পর পর সাজানো —দুই হাতে দুটি মোটা কাঠি নিয়ে চার জনে একসঙ্গে বাজায়। কাঠি-গুলির মাথায় দড়ি বা ন্যাকড়া প্যাঁচানো থাকে, তাতে ক'রে কাঠের ও কাঁসার সংঘর্ষে যে রকমের কর্কশ শব্দ হওয়া স্বাভাবিক তা হয় না,

মোলায়েম শব্দ হয়। বাজিয়ে-দলের রেয়ং যন্ত্রটি ছাড়া আর-একটি ঠিক একই ধরনের বাজনা নৃত্য-আসরের সামনে সাজানো থাকে। এই বাজনায় ঘণ্টার সংখ্যা দশ। এর নাম ট্রম্‌পং। নাচিয়ে হাতের পাখাটিকে রেখে আধ-বসা অবস্থায় নাচের ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে মাটি থেকে দুই হাতে দুটি কাঠি তুলে নিয়ে সেই বাজনা বাজাতে শুরু করে। কাঠি হাতে নিয়ে নানা ভঙ্গিতে তাকে ঘোরায় ও সেই কাঠির আঘাতে যন্ত্রে নানা প্রকার ছন্দ তোলে। অল্পক্ষণ বাজানোর পর আবার লাফাতে লাফাতে মাঝখানে ফিরে এসে পাখাটি হাতে তুলে নেয়। সকল নাচিয়ের পক্ষে ট্রম্‌পং বাজনা বাজানো সহজ নয়, এতে গামেলান -যন্ত্র ও -সংগীতের গভীর জ্ঞান থাবা প্রয়োজন। এই কারণেই সব নাচিয়ে এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে পারে নি, সকল নাচিয়ের এদিকে জ্ঞান থাকাও সম্ভব নয়।

বলিতে থাকতে দেনপাশার শহরে মারিয়ো-প্রবর্তিত নাচের এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল, সে দেশের এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে। বলিদ্বীপের দশটি নাম-করা গ্রাম্য দল এই প্রতিযোগিতায়, যোগ দেয়। দেখলাম, দশটি গ্রামের দশটি নাচিয়েই কবিয়ার নাচ নাচল, কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অনেক পার্থক্য, অথচ সকলে একই গুরুর ছাত্র। এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। একটি দল এই নাচকে কোনো-একটা গল্পের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। মহাভারতের অর্জুনকে নিয়ে গল্পটি নূতন ক'রে তৈরি, সে আমাদের দেশের সঙ্গে মেলে না। কবিয়ার-নাচিয়ে ছিল অর্জুন, আরম্ভ করল্‌ কবিয়ার নাচ দিয়ে। গামেলান-বাজনার অবশ্য কোনো বদল হয় নি। অন্য দলে দেখলাম, গামেলান-দলের জনকয়েক গাইয়ে প্রারম্ভে অনেক-ক্ষণ গান গাইল। নাচের সময় নাচিয়ে গানের ভাবকে অভিনয়ে প্রকাশ করল। কয়েকটি নাচিয়েকে দেখলাম সব সময় নাচের ভিতর দিয়ে প্রেমের অভিনয় করে গেল। দেখলাম, নাচিয়ে বাজিয়েদের মধ্যে এক-জনের সামনে গিয়ে নাচে প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গি ও অভিনয় করতে লাগল। পরীক্ষকরা শেষ পর্যন্ত প্রথম পুরস্কার দিয়াছিলেন তাকে, যে এই

ভাবের পরিবর্তন না এনে মারিয়োর পদ্ধতিতে নাচের ভিতর যতটা সম্ভব নূতনত্বের আভাস দিতে পেরেছিল। সেই প্রতিযোগিতার নাচ দেখে বেশ বুঝতে পারলাম এদের চিন্তাধারার গতি, নূতন রচনা, নূতন পরিবর্তন করতে এরা কতখানি উৎসুক। আর-একটি ঘটনায় এ বিষয়ে মনের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল।

পশ্চিম-বলির জুম্‌রানা নামে এক বড় গ্রামে মোড়লের পুত্রের বিবাহ, খুব ধুমধাম। বলির হিন্দু-প্রথায় বিবাহের অনুষ্ঠান। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই সন্ধ্যাবেলায় সমবেত হয়েছে। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। প্রাঙ্গণে গ্রামের গামেলান-দল খুব উৎসাহের সঙ্গে বাজাচ্ছে। হঠাৎ শুনি, গ্রামের একটি অতি অল্পবয়সের বালক কবিয়ার নাচ নাচছে। তখনই দেখতে গেলাম। শুনলাম, বালকটি কোনো শিক্ষকের কাছে কখনো এ নাচ শেখে নি। নাচে যারা প্রবীণ ও প্রাচীন তারাও জড়ো হয়েছে বালকের নাচ দেখতে। দেখলাম, বালকটি আপন মনে নেচে চলেছে। বাজনার সঙ্গে হয়তো কখনো মিলছে কখনো মিলছে না, তাতে গ্রামের দর্শকদের কেউ দুঃখিত নয়। সে যে না-শিখে এভাবে নাচতে পারছে এই দেখেই সকলে আনন্দিত। অনেকের মনে বিশ্বাস, ভবিষ্যতে এ বালক তাদের গ্রামের গৌরবের বিষয় হবে।

আমাদের দেশে কেরলের কথাকলি-নাচিয়ে, মনিপুরী নাচিয়েদের অনেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। উত্তর-ভারতের কথক-নাচিয়েদের কথাও জানি। এইসব প্রাচীন নাচে এ ধরনের স্বাধীনতার প্রশ্রয় দিতে এদের কখনো দেখি নি, বরঞ্চ যথাসম্ভব নিরুৎসাহ করতেই দেখা গেছে। এইখানেই আমাদের প্রাচীন নাচিয়েদের সঙ্গে এ দেশের গ্রামের নাচিয়েদের মূল তফাত।

একথা যখনই মনে হয়েছে তখনই ভেবেছি বলির হিন্দুরা শিল্পকলায় এই স্বাধীন মনোবৃত্তি পেল কোথা থেকে। সকলেই জানেন এদের বর্ত-মান ধর্ম বা সংস্কৃতি প্রাচীন হিন্দুভারতের কাছ থেকেই পাওয়া, তাই নিয়ে আজও তাদের সমাজ বেঁচে আছে। অথচ আমাদের দেশের বর্তমান

সাধারণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে এদের আকাশ-পাতাল তফাত। আমাদের দেশে রাজা-মহারাজা, ধনী ও শিক্ষিতদের সাহায্য বা প্রেরণার অভাবেই আমাদের দেশের গ্রাম্যশিল্পীরা মৃতপ্রায়, এঁদের পোষকতা ছাড়া গ্রাম্য-শিল্প বাঁচতে পারে না, এই ধারণা আমরা সকলেই মনে মনে পোষণ করি। কিন্তু বলির হিন্দুদের তো কোনোদিন রাজা-মহারাজা, ধনী বা শিক্ষিতদের সাহায্য বা প্রেরণার প্রয়োজন হয় নি। শিল্পকলার যা-কিছু উন্নতি হয়েছে সে কেবল তাদের নিজেদেরই চেষ্টায়। এখনও বলিতে যে কয়জন রাজা বা জমিদার আছেন তাঁদের একজনকেও কোনো নাচিয়ে অথবা গামেলান-সংগীতের দলকে পোষণ করতে হয় না। নাচের ও বাজনার দল সব গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানেই তৈরি হচ্ছে দরকার হলে রাজারা সেই সব গ্রামে খবর পাঠান।

জাভা এত কাছের দেশ, এবং শোনা যায় জাভায় মুসলমান ধর্মের প্রথম প্রবর্তনের সময় জাভার হিন্দুরা এবং জাভার তৎকালীন হিন্দু সংস্কৃতি বলিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; অথচ জাভার প্রাচীন সব শিল্পই সেখানকার সুলতানদের ও ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রেরণায় এতদিন বেঁচে ছিল। বহু শতাব্দী ধরে সে দেশে এই সব শিল্পের কোনো পরিবর্তন হয়েছে ব'লে কেউ বলতে পারে না; বিশেষ করে নাচ ও বাজনায়।

বিদেশিরা বলির নাম দিয়েছে 'ধরার শেষ স্বর্গ'। এই স্বর্গের মোহে প্রতি বৎসর এ দেশে অসংখ্য বিদেশির আমদানি হয়। তারা প্রশংসা করে সে দেশের নিসর্গশোভার, তার স্ত্রীপুরুষের দৈহিক সৌন্দর্যের, তাদের শিল্পের ও তাদের নাচের। আমার মনে হয়, তার চেয়েও বড় কথা এই যে, বলির অধিবাসীরা সহজ-শিল্পী, যে শিল্পী-মন নিয়ে তারা প্রতিদিনই নূতন কিছু কল্পনা করছে ও গড়ে তুলছে। বলির সবচেয়ে বড় গৌরব হচ্ছে তার শিল্পসৃষ্টির এই নিত্যনবত্ব।

---

## স্বীকৃতি

জাভা ও বলি ভ্রমণকালে সে-দেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সেই সময় চিঠিপত্রে এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ যা প্রকাশ করেছিলাম, সেগুলিই নতুন করে সাজিয়ে এখন বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হল।

এই কাজে নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে এবং পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীসুশীল রায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

১ ডিসেম্বর ১৯৫২ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ



# জাভা ও বলির নৃত্যগীত

শান্তিদেব ঘোষ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ